ষড়-অবতার

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু

প্রণীত

মূল্য বার আনা

কলিকাতা, ৪৫ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট,

ষ্টাণ্ডার্ড ড্রগ প্রেসে,

কে. সি, বসু দ্বারা মুদ্রিত।
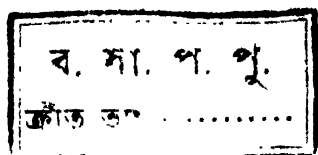
উপহার

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু,
উকিল, কলিকাতা।

সামান্য বক্তব্য

গল্প কয়টী পূর্ব্বে মাসিক পত্রে বাহির হইয়াছিল। বন্ধুবান্ধবেরা জানাইয়াছিলেন যে, পাঠ করিয়া আমোদ পাইয়াছেন তাঁহাদেরই উৎসাহে গল্পগুলি স্থান বিশেষে সামান্য পরিবর্ত্তিত ও চিত্রশোভিত করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হইল। ছয়টি গল্পের প্রত্যেকের নায়কই একটি অবতার বিশেষ বলিয়া পুস্তকের ষড়-অবতার নাম দেওয়া গেল। ষড়-অবতার, ছয়টি গল্প, ছয়খানি ছবি, পুস্তকের ও গল্পগুলির নাম ছয় অক্ষরে, মোট ছয় ফর্ম্মার মধ্যে—সবই ছয় হইলেও মূল্য কিন্তু ছয় দুগুণে বার আনা ধার্য্য করিতে হইল।

ইতি--

কলিকাতা
আশ্বিন, ১৩২৭ } লেখক

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
নতুন জামাই	১
গোড়ায় গলদ	১৭
বিষম স্বদেশী	২৮
কলির কানাই	৪৫
খুড়োর বরাত	৫৬
নকলে আসল	৭৩

সুপ্রসিদ্ধ শিল্পী

শ্রীযতীন্দ্রকুমার সেন কর্ত্তৃক

চিত্র-শোভিত।

পাহারাওয়ালা বজ্র মুষ্টিতে তাহার হাত চাপিয়া ধরিল। (১৫ পৃষ্ঠা

ষড়-অবতার

নতুন জামাই

[১]

"বাবা তুমি প্রথম শ্বশুরবাড়ী যাচ্চ, একটু সাবধানে সকল দিক বিবেচনা কোরে কাজ কর্ব্বে। তাঁরা যেন মনে না করেন, যে পাড়াগেঁয়ে জামাই কিছু জানে না। হাজার হোক তুমি যে বনেদী ঘরের ছেলে, সেটা আচার ব্যাভারে ভাল করে বুঝিয়ে দিও।"

"সে জন্যে মা তুমি কিছু ভেবো না। কলকাতার ধরণ ধারান যে আমি একবারে জানিনা তা নয়। এই ফি বছরই ত বড়দিনের সময় দশ-বার দিন কোরে কলকাতায় কাটিয়ে এসেচি, তাতে সহুরে চাল-চলন অনেকটা বুঝে নিয়েচি।"

হরিদাসের সবে দুই মাস হইল বিবাহ হইয়াছে। বিবাহের পর এই প্রথম শ্বশুরবাড়ী যাত্রা। শ্বশুরবাড়ী কলিকাতার

শ্যামবাজার পল্লীতে। শ্বশুর রমেশচন্দ্র ঘোষ অনিচ্ছা সত্ত্বেই পাড়াগাঁয়ে আদরের কন্যা সুষমার বিবাহ দিয়াছেন। কি করিবেন, কন্যাদায়গ্রস্ত গৃহস্থের সকল ইচ্ছা পূরণ হওয়া অসম্ভব। কলিকাতাতেই বিবাহ দিবেন ঠিক করিয়াছিলেন, কিন্তু সহরে ছেলের বাজার যেরূপ চড়া তাহাতে দুই বৎসর ধরিয়া চেষ্টা করিয়াও সুবিধা করিতে পারিলেন না। শেষে রমানাথপুরেই বিবাহ দিতে হইল। ছেলেটি লেখা পড়ায় সেরূপ না হইলেও, মোটের উপর বনিয়াদী ঘর, অন্নবস্ত্রের কষ্ট কখনও ভোগ করিতে হইবে না, এই যা সান্ত্বনা।

সাজসজ্জা সাঙ্গ হইলে হরিদাস মাতাকে প্রণাম করিয়া ষ্টেসনের অভিমুখে যাত্রা করিল। ট্রেনে তুলিয়া দিয়া আসিবার জন্য মাতা চাকরকে সঙ্গে দিলেন এবং ঘড়ি চেন আংটী ও টাকা কড়ি লইয়া পথে ঘাটে পুত্রকে বিশেষ সাবধান থাকিতে বলিলেন।

হরিদাস ট্রেনে উঠিয়াই মাতার উপদেশ স্মরণ করিয়া হাতের আংটী খুলিয়া ও সোনার ঘড়ি চেন পকেট হইতে বাহির করিয়া ট্যাঁকে গুঁজিল। মনে মনে স্থির করিল, পথে এগুলি আর বাহির না করিয়া শ্বশুরবাড়ীর কাছে গিয়া পরিয়া লইলেই চলিবে। তাহাকে যেন কেহ নেহাৎ পাড়াগেঁয়ে মনে না করে, মায়ের এই কথাটাই সমস্ত রাস্তা হরিদাসের মনে জাগিতে লাগিল।

[২]

যথা সময়ে ট্রেন কলিকাতার শিয়ালদহ ষ্টেশনে আসিয়া থামিলে, হরিদাস নামিয়া ঠিকাগাড়ির চেষ্টায় গেল। শ্যামবাজার যাইতে গাড়োয়ান পাঁচ সিকা ভাড়া চাহিল। হরিদাস মনে করিল যে তাহাকে পাড়াগেঁয়ে ভাবিয়া গাড়োয়ান ঠকাইবার মতলব করিয়াছে। সে বলিল—তুমি কি আমার নতুন লোক পেলে, যে শ্যামবাজার যেতে পাঁচ সিকে, আমি বরাবর ত পাঁচ আনা ছয় আনা ভাড়ায় যাচ্চি। হরিদাসের কথা শুনিয়া, "আরে কোথাকার পাড়াগেঁয়ে ভূত, পাঁচ আনায় শ্যামবাজার যাবে" বলিয়া দুষ্ট গাড়োয়ান অর্দ্ধচন্দ্র দিবার জন্য হাত বাড়াইলে, হরিদাস দৌড়িয়া পলাইয়া সে যাত্রা অপমানের হাত হইতে রক্ষা পাইল।

ষ্টেসন হইতে বাহির হইয়া হরিদাস ট্রামে উঠিয়া বসিল। ইচ্ছা রহিল শ্যামবাজারের মোড়ে ট্রাম হইতে নামিয়া আনা চারেকে একখানি গাড়ি ভাড়া করিয়া শ্বশুরবাড়ী পৌঁছিবে।

ট্রাম শ্যামবাজারের ডিপোয় পৌঁছিলে, সকল লোকের সহিত হরিদাসও নামিয়া পড়িল। বাড়ী হইতে সকালে দশটার সময় খাইয়া যাত্রা করিয়াছে, আর এখন প্রায় সন্ধ্যা ৬টা বাজিয়াছে। বাড়ীতে হরিদাসের এ সময়ের মধ্যে দুই তিন বার জলযোগ হইয়া যাইত। নিকটেই বড় একখানা খাবারের দোকানের সম্মুখে খরিদ্দারের খুব ভিড়, ভিতরের বেঞ্চে বসিয়াও পাঁচ ছয় জন জলযোগ করিতেছে,

হরিদাস ভাবিল যেরূপ ক্ষুধা পাইয়াছে তাহাতে এইখানেই কিছু খাইয়া লওয়া ভাল। কি জানি ক্ষুধার তাড়নায় যদি শ্বশুরবাড়ীতে বেশী করিয়া খাইয়া ফেলি, তাহা হইলে লোকে নিশ্চয়ই পাড়াগেঁয়ে রাক্ষস বলিয়া ঠাট্টা করিবে। হরিদাস চারি আনার খাবার লইয়া দোকানের ভিতরে খাইতে বসিল। সে যখন জঠরানল নিবৃত্তি করিতে ব্যস্ত সেই সময়ে তাহার শ্বশুরবাড়ীর ঝি সেই দোকানে তাহারই জন্য মিষ্টান্ন লইতে আসিল। কেহ কাহাকেও দেখিতে পায় নাই। খাবার লইয়া ঝি চলিয়া যাইবে, সেই সময়ে ভিতর হইতে হরিদাস বলিল "ওহে পানতুয়া বেশ হয়েচে, আর দুটো আমায় দাও ত।" গলার স্বর শুনিয়াই ঝি থম্‌কাইয়া দাঁড়াইল, দেখিল নতুন জামাইবাবু ঠোঙ্গা হাতে ভিতরে বসিয়া খাবার খাইতেছেন। এই ঝিই কনের সঙ্গে গিয়া হরিদাসের বাড়ীতে সাত দিন কাটাইয়া আসিয়াছে। ঝি এই মজার সংবাদ সকলকে জানাইবার জন্য তিলমাত্র সেখানে অপেক্ষা না করিয়া বাড়ীর দিকে দ্রুত প্রস্থান করিল।

হরিদাস আহার সাঙ্গ করিয়া, পার্শ্বের বিড়ির দোকান হইতে একটা পয়সা ভাঙ্গাইয়া নগদ অর্দ্ধপয়সার বিড়ি কিনিয়া ধূমপান সুরু করিয়া দিল। শ্বশুরবাড়ীতে এ সবের সুবিধা ত হইবেই না এই কারণে সব কয়টি বিড়িই সেইখানে সদ্গতি প্রাপ্ত হইল। বাকি অর্দ্ধ পয়সার পান কিনিবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু হরিদাস স্থির

করিল যে পান খাইয়া যাইবে না। সেখানে জানাইবে যে পান পর্য্যন্ত খায় না তাহা হইলে অনেকটা খাতিরও পাওয়া যাইতে পারে। সহরে অনেক ছেলেই আজকাল পান তামাক খায় না সে কথা হরিদাসের জানা ছিল।

কিন্তু এত ঠিক করিলে কি হয়, বিধি যাহার প্রতি বাম তাহার কিছুতেই নিস্তার নাই। হরিদাস যখন রাস্তায় দাঁড়াইয়া একমনে বিড়ির ধূম পান করিতেছিল সেই সময় তাহার জ্যেষ্ঠ শ্যালক ফুটবল খেলিয়া কয়েক জন সঙ্গীসহ বাড়ী ফিরিতেছিল। সে দেখিতে পাইয়াছিল যে নতুন জামাই রাস্তায় দাঁড়াইয়া বিড়ি খাইতেছে। সর্ব্বাঙ্গে কাদা মাখা হাপ্ প্যাণ্ট পরা ছিল বলিয়াই সে হরিদাসের সহিত দেখা না করিয়া পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল।

ধূমপান সাঙ্গ হইলে হরিদাস একখানি ভাড়াগাড়ি ঠিক করিল। মোড় হইতে বামে ফিরিয়া আট দশখানি বাড়ীর পর তাহার শ্বশুর বাড়ী। গাড়োয়ান চারি আনাতেই তাহাকে সেই বাড়ীতে পৌছিয়া দিতে রাজি হইল। হরিদাস ঠিক করিল, ভাড়াটা গাড়োয়ানকে অগ্রেই দিয়া রাখি, কত কি দিলাম কেহ জানিতে পারিবে না, আমাকে নামাইয়া দিয়াই গাড়ি চলিয়া আসিবে; সকলে মনে করিবে যে ষ্টেসন হইতে বরাবরই গাড়ি করিয়া আসিলাম। হরিদাস গাড়োয়ানের হাতে একটি টাকা দিয়া বাকি বার আনা পয়সার জন্য হাত পাতিয়া আছে, এমন সময়

তাহার শ্বশুর রমেশবাবু ট্রাম হইতে নামিয়াই সম্মুখে জামাইকে দেখিতে পাইলেন। তিনি সাধারণতঃ সন্ধ্যার পরই অফিস হইতে ফিরেন, কিন্তু আজ নতুন জামাই আসার কথা বলিয়া ঘণ্টাখানেক পূর্ব্বেই চলিয়া আসিয়াছেন।

"এই যে বাবাজী এসেচ" বলিয়া রমেশবাবু হরিদাসের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন. হরিদাস তাড়াতাড়ি তাঁহাকে প্রণাম করিল। তিনি বলিলেন, বাবাজী এটুকু আর গাড়ির কি দরকার, মিছে পয়সা খরচ। হরিদাস দ্বিরুক্তি না করিয়া শ্বশুরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল, তাহার আর টাকা ফেরত লওয়া হইল না। গাড়োয়ান তখনও একটি একটি করিয়া পয়সা গুণিতেছিল, সে কিছুই জানিতে পারিল না।

গাড়ি চড়িয়া যাওয়াও হইল না, অথচ এক টাকা বৃথা গেল, ভাবিতে ভাবিতে হরিদাস চলিতেছিল। রমেশবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, বাবাজী বাড়ীর সব ভাল ত, হরিদাস অন্যমনস্ক ছিল, উত্তর করিল—না পয়সা কিছু দিইনি। শ্বশুর জামাইয়ের এইরূপ উত্তর শুনিয়া মনে মনে হাসিলেন, আর কোন কথা বলিলেন না।

[৩]

ঝিয়ের এবং জ্যেষ্ঠ পুত্রের মুখে গৃহিণী ও বাটীর অপর সকলে জামাইয়ের আগমন বার্ত্তা পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন। কর্ত্তা জামাই সমেত বাটীতে প্রবেশ করিয়াই জ্যেষ্ঠা কন্যাকে ডাকিয়া বলিলেন,

"প্রতিমা হরিদাস এসেচে।" প্রতিমা উপর হইতেই বলিল, "সে আমরা অনেকক্ষণ আগেই খবর পেয়েচি।" হরিদাস মনে মনে ভাবিল, তাই ত খাবারের দোকানে কেহ দেখে নাই ত।

আংটী ঘড়ি চেন হরিদাসের টেঁকেই রহিয়া গেল, পরিবার আর সুবিধা হইল না। জ্যেষ্ঠ শ্যালকের সহিত বৈঠকখানায় অল্পক্ষণ গল্প করিবার পর, ভিতর হইতে জামাইয়ের ডাক পড়িল। হরিদাস তাড়াতাড়ি পকেট হইতে প্রণামির গিনি বাহির করিয়া লইয়া শ্যালকের সঙ্গে অন্দরে প্রবেশ করিল।

ভিতরে প্রবেশ করিতেই হরিদাস দেখিল দালানের এককোণে চওড়াপাড় শাড়ী পরা একজন স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া আছে। হরিদাস কোন কথা না বলিয়াই গিনিখানি সেই স্ত্রীলোকের পদতলে রাখিয়া প্রণাম করিল। প্রণাম করিতেই স্ত্রীলোকটী শশব্যস্তে সরিয়া গেল এবং কর কি কর কি বলিয়া শ্যালক গিনি খানি উঠাইয়া হরিদাসের হাতে দিল। হরিদাসের কেমন ভ্যাবা-চাকা লাগিয়া গেল।

বাটীতে শাশুড়ী ব্যতীত আর কোন বয়স্থা স্ত্রীলোক নাই, ইহাই হরিদাসের জানা ছিল। সেই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই সে প্রণাম করিল। কিন্তু হিতে বিপরীত হইল। গৃহিণী জামাই আসিবে বলিয়া কন্যাকে আলতা পরাইবার জন্য নাপিত বৌকে ডাকাইয়া আনিয়াছিলেন, নাপিত বৌ কাজ সারিয়া বাহির হইয়া

যাইবে, সেই সময়ে জামাইও অন্দরে প্রবেশ করিল। হরিদাস ভুলক্রমে নাপিত বৌকেই প্রণাম করিয়াছে।

হরিদাস গিনিখানি পুনরায় পকেটে পুরিয়া উপরে উঠিল। তাহার পা কাঁপিতেছিল, সকলই যেন কেমন গোলমাল হইয়া যাইতেছে। উপরের ঘরে গিয়া বসিতে প্রথমে জ্যেষ্ঠা শ্যালিকা আসিল, হরিদাস প্রণাম করিয়া অতি সন্তর্পণে তাঁহার দুই চারিটি কথার উত্তর দিল। কিছুক্ষণ পরে শাশুড়ী আসিলেন, হরিদাস তাড়াতাড়ি উঠিয়া, পকেট হইতে গিনি বাহির করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। তিনি জামাইকে আশীর্ব্বাদ করিয়া, অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে "বাবা বাড়ীর সব খবর ভাল, বেয়ান ভাল আছেন ত" ইত্যাদি দু একটা কথা জিজ্ঞাসা করিয়া চলিয়া গেলেন। শাশুড়ী চলিয়া যাইতেই পার্শ্বের ঘর হইতে ভীষণ হাস্যরোল উঠিল। সেই হাসিতে হরিদাসের অন্তর কিন্তু কাঁপিয়া উঠিল, বুঝিবা আবার কিছু ভুল হইয়া থাকিবে।

হরিদাস জলযোগ করিতে বসিল, বিভিন্ন পাত্রে নানারূপ ফল, নোন্‌তা খাবার ও মিষ্টান্ন সজ্জিত, চার পাঁচ প্রকারের সরবৎও রহিয়াছে। প্রতিমা বলিল 'লজ্জা করবেন না, সব খেতে হবে।' হরিদাস প্রত্যেক পাত্র হইতে সামান্য রকম কিছু খাইয়া উঠিতে যাইতেছে এমন সময় একটি ছোট গামলা করিয়া গুটি ত্রিশ পান্‌তুয়া ছোট শ্যালক হাসিয়া তাহার সম্মুখে রাখিয়া গেল।

শ্যালিকা বলিল "আপনি ত এটা খুব ভালবাসেন, একটিও ফেলতে পাবেন না।" হরিদাসের চক্ষুস্থির, তবে কি ইহাঁরা আমার দোকানে খাওয়ার কথা জানিতে পারিয়াছেন, এত সেই দোকানের পান্-তুয়াই দেখিতেছি। হরিদাস হাত ধুইয়া উঠিয়া পড়িল। 'আচ্ছা পরে সব খেতে হবে' বলিয়া শ্যালিকা মুখে কাপড চাপা দিয়া হাসিতে হাসিতে ঘরের বাহির হইয়া গেল।

প্রতিমা পানের ডিবা লইয়া পুনরায় ঘরে প্রবেশ করিবামাত্রই হরিদাস বলিল 'আজ্ঞে আমি ত পান খাই না'। প্রতিমা বলিল 'তাও কি কখনও হয়, শ্বশুরবাড়ীতে এসে দুটো একটা পান খেতে হয়, হরিদাস কিন্তু কিছুতেই রাজি হইল না। গৃহিণী দরজার বাহিরে এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিলেন, তিনি কন্যাকে ইসারায় ডাকিয়া বলিলেন জামাই যদি পান নাই খায়, তবে জোর করে খাওয়ান কেন। এমন সময় জ্যেষ্ঠ শ্যালক আসিয়া বলিল, আচ্ছা পান না খান, ধূমপানের কিছু ব্যবস্থা করবো কি? হরিদাস বলিল, আজ্ঞে ওসব আমার কখনও অভ্যাস নেই। "পাড়াগেঁয়ে অনেকে পান খায় না বলে, আবার কিন্তু ধুমপান করে, সেইজন্যেই জিজ্ঞেস করচি" বলিয়া শ্যালক বাহির হইয়া গেল। তাহার কথাগুলি হরিদাসের ভাল লাগিল না।

রাত্রে আহার করিতে বসিলে প্রতিমা হরিদাসকে জিজ্ঞাসা করিল, "আমরা যে আংটি দিয়েচি সেটা আপনার আঙ্গুলে

হয় না, পরেন নি কেন, মা বলছিলেন।" ঘড়ি চেন আংটি তখনও হরিদাসের টেঁকে গোঁজা ছিল, সে সেগুলি আর বাহির করে নাই। কিন্তু শ্যালিকার কথার উত্তরে বলিয়া ফেলিল, আমি ওসব পরা তত পছন্দ করিনা, সে জন্যে আনিনি।

[৪]

আহারের পরে হরিদাস বৈঠকখানায় বসিয়া শ্যালকদের সহিত গল্প করিতেছিল। যথা সময়ে শয়নের জন্য ডাক পড়িল। শয়ন ঘরের এক কোনে মিটি মিটি প্রদীপ জ্বলিতেছিল। হরিদাস দেখিল খাটের উপর মশারির ভিতর একজন শুইয়া আছে। প্রতিমা আসিয়া কাপড় ছাড়িয়া পরিবার জন্য হরিদাসকে একখানি কাপড় দিয়া গেল এবং দরজা বন্ধ করিয়া শুইতে বলিল। যাইবার সময় মশারি একটু তুলিয়া ভিতরের লোকটিকে কি কথাও বলিয়া গেল।

প্রতিমা বাহির হইয়া যাইলে হরিদাস দরজায় খিল লাগাইয়া দিল। কাপড় ছাড়িবার সময় অসাবধানতা বশতঃ ঘড়ি চেন ও আংটী তিনটীই ঘরের মেঝেয় পড়িয়া গেল। হরিদাস শশব্যস্তে তুলিয়া দেখিল ঘড়ির কাচখানা ভাঙ্গিয়া সেটি শব্দশূন্য হইয়া গিয়াছে, চেনটা ঠিক আছে। আংটীটি খাটের তলায় কোথায় প্রবেশ করিয়াছে, সন্ধান পাওয়া গেল না। হরিদাস মশারি উঠাইয়া বলিল, সুষমা একবার নেমে দেখ ত, আংটীটা কোথায়

গেল। সুষমা কিন্তু কোন উত্তর দিল না। হরিদাস আবার বলিল তাহাতেও উত্তর মিলিল না। শেষে অল্প রাগিয়া, কাজের সময় আমি ওসব কলকাতার চাল ভালবাসি না। ঘড়িটা ত চুরমার হয়ে গেল, এখন উঠে একবার আংটীটা খোঁজ কর বলিয়া সুষমার অবগুণ্ঠন সরাইয়া হরিদাস বিশেষ অপ্রস্তুত হইয়া গেল। একি এযে একটি বালিসকে শাড়ী পরাইয়া ঘোমটা দিয়া রাখিয়াছে। সেই সময়ে খাটের তলা হইতে হরিদাসের কনিষ্ঠ শ্যালক হাসিয়া বাহির হইয়া, দরজা খুলিয়া চলিয়া গেল। হরিদাস তখন ভাবিতে লাগিল, আমার আগেই দেখা উচিত ছিল সে সত্যই কোন লোক শুইয়া আছে কিনা।

অল্পক্ষণ পরেই প্রতিমা সুষমার হাত ধরিয়া হাসিতে হাসিতে ঘরে প্রবেশ করিল এবং সুষমার হাত দিয়া হরিদাসের হাতে একটী আংটী পরাইয়া দিয়া, "অনেক রাত্রি হয়েচে শুয়ে পড়ুন" বলিয়া বাহির হইয়া গেল। হরিদাস দেখিল এযে তাহারই আংটী।

কনিষ্ঠ শ্যালক খাটের নীচে লুকাইয়া থাকার সময় আংটীটা পাইয়াছিল, পরে সে বাহির হইয়া গিয়া তাহার দিদির নিকট সেইটী দিয়াছিল।

হরিদাস চুপ করিয়া শুইয়া পড়িল। মনে মনে স্থির করিল, সুষমা অগ্রে কথা না কহিলে সে কিছুতেই কথা কহিবে না। সুষমাও দরজা বন্ধ করিয়া ধীরে ধীরে শয়ন করিল। পনের

বিশ মিনিট কাল কেহই কোন কথা কহিল না। হরিদাস দেখিল যে সময়টা বৃথাই যাইতেছে, তখন বলিল—এ রকম কোরে আমাকে অপ্রস্তুত করা কেন?

সুষমা ধীরে ধীরে উত্তর করিল "কি রকম"

"কি রকম আবার জান না, এই একটা বালিশকে কাপড় পরিয়ে রেখে,"

সুষমা বলিল—"তা তোমার ভাল করে দেখা উচিত ছিল, যে সত্যিই কোন লোক শুয়ে আছে কিনা। আচ্ছা তুমি মাকে একটা আধলা দিয়ে প্রণাম কল্লে কি বোলে।"

"এ্যাঁ তাই নাকি" বলিয়া হরিদাস উঠিয়া পড়িল। তাড়াতাড়ি আলো জ্বালিয়া পকেটে হাত দিয়া দেখিল গিনিটা যথাস্থানে রহিয়াছে। সে ভুলক্রমে বিড়িক্রয়ের সময় প্রাপ্ত চকচকে আধলাটাই দিয়াছে। সেই জন্যই প্রণামের পরই হাস্যরোল শুনা গিয়াছিল।

হরিদাস বলিল—তাই ত বড় ভুল হয়েচে।

সুষমা বলিল—কোনটাতে তোমার ভুল হয় নি, সবেতেই ত তুমি ভুল করেচ।

"কেন আবার কিসে ভুল দেখলে?"

"আচ্ছা দোকানে বসে খাবার খাচ্ছিলে কেন। আমাদের ঝি সেই সময়ে দোকানে গিয়ে তোমায় দেখতে পেয়ে বাড়ীতে

এসে বল্লে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে তুমি বিড়ি খাচ্ছিলে তাও দাদা দেখে এসে দিদিকে বলছিল।"

হরিদাস দেখিল তাহার সকল বিদ্যাই জাহির হইয়া পড়িয়াছে। সেই জন্যই জলযোগের সময় অত পানতুয়া হাজির হইয়াছিল, আর শ্যালক ধূমপানের কথা বলিয়াছিল। সুষমার কথার উত্তরে সে কি বলিবে স্থির করিতে না পারিয়া বলিয়া ফেলিল, "সেই কোন সকালে খেয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়েচি, খিদে পেয়েছিল আর কি করি!"

তোমাদের পাড়াগেঁয়ে লোকের কিছু বুদ্ধি নেই, খিদে পেয়েছিল ষ্টেশন থেকে নেমেই কোনও দোকানে বসে খেয়ে নিলে হোত, তুমি একবারে বাড়ীর কাচে এসে দোকানে খেতে বসলে।

হরিদাস সুষমার মুখে "পাড়াগেঁয়ে" কথা শুনিয়া একটু চটিয়া গেল। বলিল—জান আমি তোমার স্বামী, তুমিও আমাকে 'পাড়াগেঁয়ে' বোলচ।

আমি কেন বোলব, সকলে বলছিল, তাই বল্লুম। বাবা মাকে বলছিলেন—"জামাইকে এক কথা জিজ্ঞাসা করলুম, আর সে আর এক রকম উত্তর দিলে, পাড়াগেঁয়ে ছেলে একটু চালাক চতুর কম।" দিদি মাকে বলছিল "জামাইয়ের নামটাও বড় পাড়াগেঁয়ে ধরণের ও নামটা বদ্‌লাতে হবে।"

হরিদাসের রাগটা তখন আরও চড়িয়া গেল, সে বলিল—আমি তোমার ও সব কথা আর শুনতে চাই না।

সুষমা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিল, আচ্ছা তুমি দিদিকে কেন মিছে করে বল্লে যে আংটী আনিনি, আবার তা হলে কোথা থেকে বেরুলো।

হরিদাসের মাথা একেবারে গরম হইয়া গিয়াছে, "চুপ কর বোলচি" বলিয়া সে চিৎকার করিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইতেও হাসির রোল শুনা গেল। হরিদাস বুঝিল যে বাহিরে যাহারা দাঁড়াইয়াছিল, তাহারা তাহার কথা শুনিতে পাইয়াছে।

সুসমার আর কোন কথা কহিতে সাহস হইল না। হরিদাস স্থির করিল, এ বাটীতে আর তাহার থাকা হইবে না, ভোরে উঠিয়াই সকলের অজ্ঞাতে সে প্রস্থান করিবে। এ রকম অপদস্থ হইয়া লোকের কাছে মুখ দেখান হইবে না। সুষমা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। হরিদাসও ভাবিল এইবার একটু ঘুমাইয়া লই, খুব ভোরেই উঠিব।

[৫]

হঠাৎ কি একটা শব্দে হরিদাসের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। হরিদাস তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল। সুষমা তখন অঘোরে ঘুমাইতেছে। হরিদাস আলো জ্বালিয়া নিজের কাপড় জামা পরিল। ঘড়িটি পূর্ব্বেই অচল হইয়া গিয়াছে, কত বাজিয়াছে

সে আন্দাজ করিতে পারিল না। শীঘ্রই ভোর হইবে মনে করিয়া আস্তে আস্তে খিল খুলিয়া নীচে নামিয়া গেল। সদর দরজা খুলিয়া যখন হরিদাস রাস্তায় বাহির হইল তখনও বাড়ীর কেহ জানিল না, যে জামাই পলাইয়া যাইতেছে। রাস্তায় বাহির হইয়া হরিদাস যেন হাফ ছাড়িয়া বাঁচিল। কিন্তু বরাতে যার নিগ্রহ আছে তার কিছুতেই নিস্তার নাই। হরিদাস সবে মাত্র আট দশ হাত গিয়াছে, এমন সময়ে পশ্চাৎ হইতে এক পাহারাওয়ালা দৌড়িয়া আসিয়া "শালা তোম্ রোজ চোরি করকে ভাগ্‌তা হায়" বলিয়া বজ্র মুষ্টিতে তাহার হাত চাপিয়া ধরিল। উপস্থিত বিপদে সে যেন কিরূপ হইয়া গেল, বলিল—"আমি চোর নই, ও বাড়ীর লোক।"

"আচ্ছা শালা তোম্ সাধু হায়, চল্"—বলিয়া পাহারাওয়ালা পুনরায় তাহাকে শ্বশুরবাড়ীর দিকে টানিয়া লইয়া চলিল।

ইতিপূর্ব্বে রমেশ বাবুর বাড়ীতে পর পর দুই দিন চুরি হইয়া গিয়াছিল। সে জন্য তিনি বিটের পাহারাওয়ালাকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন—"হোলী, পূজা, বড়াদিন সবমে তোম্ লোককো বক্‌সিস্ দেতা, তব্‌ভি হামরা কোঠিমে দো রোজ চোরি হো গিয়া, তোম্ লোক কুচ্ খেয়াল রাখ্‌তা নেহি।" পাহারাওয়ালা উত্তরে বলিয়াছিল "আচ্ছা বাবুজী হাম্ আপ্‌কো কুঠীকা উপর নজর রাখেগা।" সেই দিন হইতেই পাহারাওয়ালা

রমেশবাবুর বাড়ীর উপর একটু বিশেষ নজর রাখিতেছিল। হরিদাস যখন বাড়ী হইতে বাহির হয়, তখন সে তিন চারি খানা বাড়ীর পরে একটা রোয়াকে বসিয়াছিল এবং এত রাত্রে একজন অপরিচিত লোক বাড়ী হইতে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া যাইতেছে দেখিয়া দৌড়িয়া আসিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। রমেশ বাবুর বাড়ীর সকলকেই সে চিনিত।

হরিদাসকে ধরিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া পাহারাওয়ালা হাঁকিল "বাবুজী শালা চোরকো পাকড়া।" তাহার এক হাঁকেই কর্ত্তার, গিন্নির ও জ্যেষ্ঠপুত্রের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। কর্ত্তা বিছানার উপর হইতেই বলিলেন—মার ব্যাটাকে। গৃহিণী তাড়াতাড়ি আলো লইয়া নীচে নামিয়া গেলেন। পুত্রও লাঠি লইয়া উপস্থিত হইল।

পাহারাওয়ালা উঠানের মাঝখানে চোরকে ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। চোর মুখ নত করিয়াছিল। চোরের মুখের কাছে আলো ধরিয়াই গৃহিণী—"ও মা এ যে নতুন জামাই" বলিয়া পাঁচ হাত পিছাইয়া আসিলেন। পুত্রের হাতের লাঠিও খসিয়া পড়িল।

গোড়ায় গলদ

[১]

অবসর সময়ে আপনাকে পাইয়াছি বলিয়া মনে করিবেন না যে গল্প করিতেছি। নির্ছাক সত্য ঘটনাই বলিব। বন্ধু বান্ধবকে জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারিবেন যে যতিন ঘোষাল কখনও বাজে গল্পে সময় নষ্ট করে না। ঘটনাটা আপনাকে বলার উদ্দেশ্য যে আপনার কখনও এরূপ বিভ্রাট না ঘটে। কারণ সেদিন আমাকে বিশেষ ভুগিতে হইয়াছিল এবং এতকাল পরেও তাহার জের শেষ হয় নাই।

আট দশ বৎসর পূর্ব্বেকার কথা—শীতকাল। একদিন সকালে তাড়াতাড়ি আহারাদি সারিয়া সিমলার বাটী হইতে বাহির হইলাম। ভবানীপুর যাইতে হইবে। সঙ্গে ১০৲ টাকার দশ খানি নোট ছিল, গলির মোড়ে বড় রাস্তার উপর পোদ্দারের দোকান হইতে তাহার তিন খানি ভাঙ্গাইয়া লইতে হইবে। দোকানে গিয়া পকেট হইতে নোটগুলি বাহির করিয়া তিন খানি পোদ্দারকে দিলাম, সে ৩০টী টাকা দিল। টাকাগুলি বাজাইয়া লইতেছি এমন সময় ট্রাম আসিয়া পড়িল, ৭টী টাকা

না বাজাইয়া, সকলগুলি পকেটে পুরিয়া তাড়াতাড়ি ট্রামে উঠিয়া পড়িলাম।

ট্রাম কিছুদূর চলিয়া গেলে পকেটে হাত দিয়া দেখিলাম, এ কি? বাকি নোটগুলি কোথায় গেল। নিশ্চয় দোকানে ফেলিয়া আসিয়াছি। তৎক্ষণাৎ ট্রাম হইতে নামিয়া পড়িয়া দোকানের দিকে ছুটিলাম। দোকানে পৌছিয়াই বলিলাম বাকি নোটগুলো এখানে ফেলেগেছি শীগ্গির দাও।

পোদ্দার বলিল, সে কি মশাই বাকি নোট কি?

আমি স্বর আরও চড়াইয়া বলিলাম, আমার সঙ্গে চালাকি, আমি দশ খানা নোট দিয়েচি তিনখানার দরুণ তুমি ৩০৲ টাকা দিয়েচ, বাকি ৭ খানা ট্রাম এসে পড়াতে তাড়াতাড়ি ফেলেগেছি। এখনি ফেরত দাও, আমার সঙ্গে জুয়াচুরী, আমি তোমার আর একটা কথাও শুনতে চাই না। চীৎকারে দোকানের সম্মুখে অনেক লোক জমিয়া গেল।

পোদ্দার বলিল "মশাই আপনি অন্যায় বলচেন, আমি অল্পক্ষণ মাত্র দোকান খুলেচি, আপনিই প্রথম নোট ভাঙ্গইয়েচেন, বাক্স খুলে দেখাচ্চি আপনার দেওয়া তিনখানা নোট ছাড়া দোকানে আর একখানাও নোট নেই।"

আমার রাগ আরও বাড়িয়া গেল, বলিলাম "জুয়াচোর, তোমার যে চাকর দোকান সাফ্ করছিল সে কোথায়?

গেল, তুমি নিশ্চয় তাকে নোটগুলো দিয়ে আর কোথাও পাঠিয়েচ।"

"সে একটা কাজে গেছে, আপনার নোটের বিষয় আমি কিছুই জানি না।"

"তুমি জান কি না জান আমি এখনই তা দেখাচ্চি, থানায় চল্লুম" বলিয়া আমি ভিড় সরাইয়া বাহির হইয়া থানার দিকে ছুটিলাম।

থানায় পৌঁছিয়া দেখি ইনেস্পেকটর মহাশয় সম্মুখেই বসিয়া আছেন। তাঁহাকে সকল কথা বলাতেই, তিনি বলিয়া উঠিলেন, ঐ পোদ্দারটা ভারি শয়তান, ওর কাছ থেকে অল্পদিন হো'ল একখানা এক শত টাকার জাল নোট বার হয়েছিল, কিন্তু বিচারে বেটা বেকসুর খালাস পেয়েচে। এইবার আপনার এই 'কেসে' আমি ও বেটাকে জব্দ করে ছাড়বো।

আমি বলিলাম, তা হোলে তো সাংঘাতিক লোক। ইনেস্পেক-টর বাবু বলিলেন আপনি নোটগুলো ওর হাতে দিয়েচেন এ কথা লিখতে হবে। আমি বলিলাম, হাতে দিই নি মনে আছে তাড়াতাড়িতে ফেলে যাওয়াই সম্ভব। হাতে দিয়েচি একথা লেখাটা কি ঠিক।" ইনেস্পেকটর বাবু একটু স্বর চড়াইয়া বলিলেন, যদি লিখতে পারবেন না তবে এখানে এসেচেন কেন, আমরা কিছু সুবিধে করতে পারবো না। বেগতিক দেখিয়া

ইনেস্পেক্‌টর বাবুর নির্দ্দেশ মতই লিখিয়া দিলাম। ইনেস্পেক্‌-টর বাবু নিজে এক ঘণ্টা পরে তদন্তে যাইবেন এবং আমাকেও সেই সময় উপস্থিত হইতে আদেশ দিলেন।

[১]

বাসায় ফিরিয়া আসিয়া চুরির কথা সকলকে শুনাইলাম। সকলেই বলিলেন, "তিন পোদ্দার বেটাকে সহজে ছেড়ো না, বেটা দোকান খুলে দিনে ডাকাতি আরম্ভ করেচে।

অল্পক্ষণ পরেই দাদাকে সঙ্গে লইয়া থানায় উপস্থিত হইলাম, ইনেস্পেক্‌টর বাবু সাজ গোজ করিয়া একজন পাহারাওয়ালা ও একজন জমাদার লইয়া আমাদের সঙ্গে বাহির হইলেন। 'বেটাকে এবার একবারে জব্দ করে ছাড়বো' পথে একথা অনেকবারই বলিলেন। দাদাও তাঁহার সঙ্গে যোগ দিতে ছাড়িলেন না।

ইনেস্পেক্‌টর বাবু দোকানের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া মহা চীৎকার ও ভূমিতে পদাঘাত করিতে করিতে বলিলেন, "শালা এবার তোমায় কে রক্ষা করে দেখ্‌বো, নোটগুলো কোথায় সরিয়েচিস্‌ শীগ্গির বল্‌।"

পোদ্দার ভীতকণ্ঠে অস্পষ্টস্বরে বলিল "হুজুর আমি কিছুই জানি না হুজুর।"

"কিছুই জাননা বেটা সাধুপুরুষ" বলিয়া ইনেস্পেক্টর বাবু

চীৎকার করিয়া উঠিলেন। পোদ্দারের বাক্‌শক্তি একবারেই রুদ্ধ হইয়া গেল।

সংবাদ পাইয়া পোদ্দারের বৃদ্ধ পিতা নিকটস্থ বাটী হইতে কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া একবারে ইনেস্পেক্টর বাবুর পা জড়াইয়া ধরিলেন। অনেক করিয়া বুঝাইতে লাগিলেন: "যে তাহার পুত্র নির্দ্দোষ। এ দোকান ৩৫ বৎসর কাল চলিতেছে, কখনও কাহারও সহিত এক পয়সার গোলমাল হয় নাই।"

বৃদ্ধের রোদনে ইনেস্পেক্টর বাবু অনেকটা নরম হইয়া গেলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "দোকানের চাকরটা কোথায়।" সকলেই চাকরের খোঁজ করিতে লাগিল, কিন্তু নিকটে কোথাও তাহাকে পাওয়া গেল না।

চাকরটা গোলযোগের কথা পূর্ব্বেই শুনিয়াছিল এবং প্রতি মুহূর্ত্তেই, পুলিস আসিয়া পড়িল এইরূপ কল্পনা করিতেছিল। যখন দেখিল দূরে ইনেস্পেক্টর ও তৎসঙ্গে লাল পাগড়ী আসিতেছে—তখনই সে পলায়ন করিয়াছে।

যখন নিকটে চাকরকে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না, তখন বৃদ্ধ বলিল "হুজুর হয়তো সে ভয়ে পালিয়েগেচে, আমি যে কোরে হোক আজ রাত্রের মধ্যে তাকে খুঁজে বার করচি, তার যাবার জায়গা কোথাও নেই। সে পিতৃ-মাতৃ হীন, শিশুকাল থেকেই আমার বাড়ীতে প্রতিপালিত। হুজুর আজকের মত যদি তদন্তটা বন্ধ

রাখেন তা হোলে সমস্ত ব্যাপারটা আমি নিজে একবার অনুসন্ধান কোরে দেখি।' বলিয়াই বৃদ্ধ আবার ইনেস্পেক্টর বাবুর পা জড়াইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

ইনেস্পেক্টর বাবুর কি মনে হইল, তিনি বলিলেন, আচ্ছা পা ছাড়, তোমার ইচ্ছামত আমি এখন তদন্ত স্থগিত রাখলুম। কিন্তু কাল সকালেই এ বিষয়ের একটা শেষ করতে চাই। পরে তিনি নমস্কার করিয়া আমাদের নিকট বিদায় চাহিলেন এবং পরদিন সকাল ৭ টার মধ্যেই আমরা যাহাতে থানায় উপস্থিত হই তাহার জন্য বলিয়া গেলেন।

ইনস্পেক্টর বাবু পশ্চাৎ ফিরিতেই রাস্তার অপর পারের কয়েকটা দোকানদার আমাদের দুই ভাইকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। একজন বলিল, মশাই আমি স্বচক্ষে দেখলুম আপনি যেই ট্রামে উঠলেন, তখনই পোদ্দারটা আপনার নোট কখানা চাকর দিয়ে কোথায় পাঠিয়ে দিলে। আর একজন বলিল, মশাই ওটা বড় ভয়ানক লোক, আপনারা সহজে ছাড়বেন না। আমরা সকলেই আপনার তরফে সাক্ষী দিতে প্রস্তুত, এমন লোককে শাস্তি দেওয়াই কর্ত্তব্য। দাদা বলিলেন, নিশ্চয়ই আমরা শাস্তি না দিয়ে কি ছাড়বো, এ যে একেবারে দিনে ডাকাতি। বেটার দোকান যদি না ওঠাতে পারি তবে আমার নাম নবীন ঘোষালই নয়। এই তো মশাই আপনি স্বচক্ষে

দেখেচেন যে নোটগুলো সরালে তবুও বলে কিনা আমি কিছুই জানি না। আপনারা যে সাক্ষী দিয়ে আমাদের উপকার করতে রাজী হয়েচেন সে জন্যে আপনাদের বিশেষ ধন্যবাদ জানাচ্চি।

'এ আর উপকার কি মশাই এ যে আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্মেরই মধ্যে। চক্ষের সামনে ঘটনাটা দেখে আর কি চুপ কোরে থাকতে পারা যায়, আপনিই বলুন না।'

এরূপভাবে এতগুলি প্রত্যক্ষ সাক্ষী যে আমরা পাইব তাহা একবারও ভাবি নাই। রাস্তায় আসিতে দাদা বলিলেন, যতিন "পাপের প্রতিফল লোকে ভোগ করবেই, কে জান্তো যে অযাচিত ভাবে এতগুলো সাক্ষী পাওয়া যাবে, এসব ভগবানের ইচ্ছে।"

[৩]

বাটী আসিয়া দাদা আপনার ঘরে প্রবেশ করিলেন। আমিও খবর শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে কিছুক্ষণ আলোচনা করিয়া নিজের ঘরে উপরে চলিয়া গেলাম।

একে অর্থ নষ্ট, তাহাতে সমস্ত দিন ছুটাছুটি করিয়া শরীর ও মন অত্যন্ত অবসন্ন বোধ হইতেছিল। পোষাক খুলিয়া কিছুক্ষণ ছাদে গিয়া বসিব স্থির করিলাম। নানারূপ চিন্তা করিতে করিতে জুতা মোজা কোট খুলিলাম। ওয়েষ্ট কোটের গোটা কতক বোতাম খুলিতেই ঠক্ করিয়া

মেঝেতে কি পড়িয়া গেল। দেখিলাম, এ কি? এই যে সেই সাত খানা নোট এক সঙ্গে মোড়া। মাথা ঘুরিতে লাগিল, চক্ষেও যেন কম দেখিতে লাগিলাম। মনে হইল এ কয়খানা চুরি গিয়াছিল ভালই হইয়াছিল, আবার কেন আসিল। এখন উপায় কি করি। মনে মনে বলিলাম, বসুধা দ্বিধা হও, আমি তোমার ভিতরে প্রবেশ করি। কি করিয়া লোকের কাছে বলিব যে নোট কয়খানি আমার কাছেই ছিল আমি বৃথা সমস্ত দিন ছুটাছুটি করিয়াছি ; মিছা-মিছি একটা নিরীহ লোককে চোর সাজাইয়াছি। নোট হারাইয়া আমার যে কষ্ট হইয়াছিল, এখন অন্তরে তাহার শতগুণ অধিক কষ্ট অনুভব করিতে লাগিলাম। নোটগুলি তুলিয়া লইলাম, সেগুলি যেন আমাকে দংশন করিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়া রহিলাম, পরে উঠিয়া ধীরে ধীরে দাদার ঘরে প্রবেশ করিলাম। দাদা আমার মুখের ভাব দেখিয়াই বলিলেন, টাকা গেছে তার জন্যে এত ভাবনা কেন। আমি অপরাধীর মত অস্ফুটস্বরে বলিলাম "নোট চুরি যায় নি, আমার ওয়েষ্ট কোটের ভেতরেই ছিলো, এই দেখুন।" দাদা বিছানায় শুইয়া ছিলেন, আমার কথা শুনিয়াই "এ্যাঁ বলিস্ কি" বলিয়া উঠিয়া বসিলেন। বলিলাম, "বোধ হয় ট্রামে ওঠবার সময় তাড়াতাড়িতে কোটের ভেতরের

'এ কি ? এই যে সেই 'সাত খানা নোট'

পকেটে নোটগুলো না রেখে ওয়েষ্ট কোটের কাটার মধ্যে পুরে দিয়েছিলুম।" কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া দাদা বলিলেন, আচ্ছা তুই ঘরে যা, আমি সমস্ত ঠিক করচি।

ঘরে যাইয়া বসিলাম, নানারূপ চিন্তার উদয় হইতে লাগিল। কিছুতেই স্থির করিতে পারিলাম না যে নিকটস্থ দোকানদারগুলা কেন পোদ্দারের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার জন্য এত আগ্রহ প্রকাশ করিতেছিল। বৌদিদি আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, ঠাকুরপো এযে একবারে গোড়ায় গলদ এমন ভূলও হয়। আমার মুখ দিয়া কোন উত্তর বাহির হইল না, তিনিও আর অপেক্ষা না করিয়া কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলেন। সেদিন রাত্রে নাম মাত্র আহার করিয়া ৯টার মধ্যেই ঘুমাইয়া পড়িলাম।

দাদার ডাকাডাকিতে পরদিন সকাল বেলা ঘুম হইতে উঠিলাম। দাদা বলিলেন, শীগ্গির মুখ হাত ধুয়ে নীচে আয়। বাহিরের ঘরে দাদার সম্মুখে উপস্থিত হইতেই তিনি আদেশ করিলেন, এখনই থানায় যা, বোলে আয় যে আমরা চুরির বিষয়ে আর কিছু করতে চাই না।"

ইনস্পেক্টর বাবু নিজ কোয়ার্টারে বসিয়া চা পান করিতেছিলেন, আমি গিয়া নমস্কার করিলাম। তিনি বলিলেন, যতিন বাবু আপনার দাদা কোথায়। আমি উত্তর করিলাম "আমরা এ 'কেস্'

আর চলাবো না, সেজন্যে আপনাকে জানাতে এসেচি।" ইনেস্পেক্টর বাবু একটু রাগত ভাবে বলিলেন, এ আপনাদের বিশেষ অন্যায়, চোরকে কিছুতেই প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। 'দাদার আদেশ' বলিয়া নমস্কার করিয়া আমি বাটী ফিরিলাম।

ঘটনার পরবৎসর আমার বিবাহের সময় হইতেই ঐ পোদ্দারের দোকান ভিন্ন আমরা আর কোথাও গহনাপত্র প্রস্তুত করিতে দিই না। পোদ্দারও আমাদের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ, কারণ তাহার ধারণা যে আমরা তাহার বিরুদ্ধে নোট চুরির অভিযোগ তুলিয়া লইয়া তাহাকে সে যাত্রা বিশেষ বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছি। কিন্তু আমি যে নিরীহ লোককে চোর অপবাদ দিয়া সর্ব্বসমক্ষে বিশেষ অপমান করিয়াছি, সে ক্ষোভ আমার এতদিনেও মিটিল না---বোধ হয় মিটিবেও না।

বিষম স্বদেশী

[১]

সমরেন্দ্র যখন এম, এ পড়িতেছিল, তখন দেশে স্বদেশী আন্দোলন বিশেসরূপ জাঁকিয়া উঠিয়াছে। সে আন্দোলনে সমস্ত দেশবাসীর মনই অল্পাধিক দেশের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। হঠাৎ একদিন কলেজ স্কোয়ার হইতে স্বদেশী বক্তৃতা শুনিয়া আসিয়াই সমরেন্দ্র বলিয়া উঠিল, "আমার লেখা পড়া করা হবে না।" মেসের অপর সকলে যখন কারণ জিজ্ঞাসা করিল তখন সে দৃঢ় ভাবে উত্তর করিল "স্বদেশের সেবার জন্যে নিজেকে অর্পন কর্ব্বো।"

সমরেন্দ্র নিজের ঘরে বসিয়া সম্মুখে ভারতবর্ষের মানচিত্র খুলিয়া রাখিয়া কি ভাবিতেছিল, সেই সময়ে অমর ধীরে ধীরে গৃহে প্রবেশ করিয়া সমরেন্দ্রের স্কন্ধে হাত দিতে তাহার চমক ভাঙ্গিল। অমর জিজ্ঞাসা করিল, "তুই কি ভাবছিলি বল তো।"

"কি আর ভাব্‌বো, একবার নিজের মাতৃভূমির—স্বদেশের ম্যাপ্‌টা দেখ্‌ছিলুম" বলিয়া সমরেন্দ্র অমরের হাত ধরিয়া তাহাকে নিজের পার্শ্বে বসাইল।

বিষম স্বদেশী

"সমর সত্যিই কি তুই লেখাপড়া ছাড়বি স্থির করেছিস।"

"ছাড়াবো কি, ছেড়েছি, এখন কেবল মনে স্বদেশের চিন্তা, লেখাপড়ার চিন্তা একবারে ত্যাগ করেছি।"

"কাজটা কিন্তু ভাল করলিনা, অন্ততঃ আর চার মাস পরে একজামিন দিয়ে যা ইচ্ছে করলে ভাল হো'ত। তোর বাবা একথা শুনে বিশেষ দুঃখিত হবেন।"

"না অমর, তোমরা আর আমার মনকে কিছুতেই ফেরাতে পারবে না। আমি স্বদেশের সেবাই জীবনের ব্রত করে নিয়েছি।" অমর আর কোন কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

অমর চলিয়া গেলে সমরেন্দ্র মনে মনে বলিতে লাগিল, না কিছুতেই সঙ্কল্প ত্যাগ করা হইবে না। দেশের জন্য ত্যাগ-স্বীকার করিতেই হইবে। নিজের স্বার্থ রক্ষা করিয়া স্বদেশের মঙ্গলের চেষ্টা অসম্ভব। যে দেশের শতকরা ৯৫ জন লোকই নিরক্ষর, সে দেশের মধ্যে দুই একজন লেখাপড়া শিখিয়া, পাশ করিয়া কি করিবে। তবে কেন বৃথা সময় নষ্ট করি। আমি পাশ করিলে দেশের যে কোন লাভ হইবে এমন বোধ হয় না। সকল লোকই নিজের স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত, দেশের জন্য কয়জনের প্রাণ কাঁদে? আমাকে আদর্শ স্বদেশ সেবক হইতে হইবে। দেশের কার্য্যে কিরূপে আত্মত্যাগ করিতে হয়, তাহা সকলকে দেখাইব।

[২]

সমরেন্দ্র মহেশপুরের জমিদার হরিহর রায়ের একমাত্র সন্তান। তাহার কোন কিছুরই অভাব ছিল না। রায় মহাশয় পুত্রের খরচের জন্য মাসে মাসে ৬০৲ টাকা করিয়া পাঠাইতেন। সমরেন্দ্র নিজের খরচের জন্য ৪৫৲ টাকা রাখিয়া, তিনটা দরিদ্র সহপাঠীকে মাসিক ৫৲ টাকা হিসাবে সাহায্য করিত। স্বগ্রামে পিতার প্রতিষ্ঠিত 'হরিহর ইনষ্টিটিউসন' হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া সমরেন্দ্র যখন ছয় বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার কলেজে ভর্ত্তী হইতে আসিয়াছিল, সে সময় মাতা জ্ঞানদা দেবী কিছুতেই একমাত্র সন্তানকে বিদেশে পাঠাইতে রাজি ছিলেন না। হরিহর বাবু পুত্রের বিদ্যাশিক্ষা ও ভবিষ্যৎ মঙ্গলের কথা ইত্যাদি বুঝাইয়া তবে পত্নীকে রাজি করিয়াছিলেন।

অমরের বাটীও মহেশপুর। উভয় পরিবারে বিশেষ সৌহৃদ্য ছিল। জ্ঞানদাদেবী অমরের উপরই নিজপুত্রের তত্ত্বাবধান ভার দিয়া অনেকটা নিশ্চিন্ত ছিলেন। সমরেন্দ্রও স্বগ্রামবাসী সহপাঠীকে প্রাণের সহিত ভালবাসিত। উভয়েই অতি সৎস্বভাবাপন্ন বলিয়া মেসের সকলের নিকট সমাদর পাইত। সমরেন্দ্র হঠাৎ খেয়াল বশতঃ লেখাপড়া বন্ধ করিল বলিয়া সকলেই একটু দুঃখিত হইয়াছিল।

বিষম স্বদেশী

কয়দিন পরেই সমরেন্দ্র নিজের ঘর হইতে টেবিল চেয়ার ও তক্তাপোষ বাহির করিয়া দিল। মেঝেতে কম্বল বিছাইয়া তাহার এক পার্শ্বে শয্যা ও অপর পার্শ্বে বসিবার স্থান হইল। যতদূর সম্ভব বিদেশী সরঞ্জাম পরিত্যাগ করিল। কলেজ হইতে বাসায় আসিয়া অমর সমরেন্দ্রের ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল যে সে কম্বলের উপর বসিয়া এক মনে কি ভাবিতেছে।

"সমর লেখাপড়া না হয় বন্ধ করলি, কিন্তু যাতে নিজের স্বাস্থ্য বজায় থাকে তাতো করা উচিত" বলিয়া অমর সমরেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

সমরেন্দ্র উত্তর করিল, "দেশের শতকরা নব্বুই জনেরই যে মাটিতে শয্যা, তার কি কিছু খোঁজ রাখ।"

"তা জানি কিন্তু তাদের অবস্থার সঙ্গে তো তোর অবস্থার তুলনা হতে পারে না।"

"না এখন আর আমি কোন পার্থক্য দেখি না, সকলেই আমার স্বদেশবাসী, আমার ভাই, আমাদের সকলের অবস্থা এক।" অমর দেখিল তর্ক করা মিথ্যা, সেজন্য চুপ করিয়া গেল।

সমস্ত রাত্রি কঠিন মেঝেতে নিদ্রা গিয়া প্রাতে সর্ব্বাঙ্গে বেদনা লইয়া উঠিয়া সমরেন্দ্র ভাবিল, এই ত দেশ-ভক্তের প্রকৃত পুরস্কার।

স্বদেশী সভায় বক্তার জ্বালাময়ী বক্তৃতা শুনিয়া সমরেন্দ্র

যেদিন ভাবে বিভোর হইয়া সম্পূর্ণ বিলাতী বর্জ্জনের প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিল, সেই দিনই মেসে আহারে বসিয়া দেখিল, বিলাতী কুমড়ার তরকারী, আর বিলাতী আমড়ার চাট্নী—কি ভীষণ! সমরেন্দ্র কিছুতেই আর নিজেকে স্থির রাখিতে পারিল না। ভাত তরকারী সমস্ত ফেলিয়া দিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "আমায় পরীক্ষা, আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের চেষ্টা!" ঠাকুর চাকর দৌড়িয়া আসিল কিন্তু তাহার রুদ্র মূর্ত্তি দেখিয়া কেহ কোন কথা বলিতে সাহস করিল না। সেদিন সমরেন্দ্রের বিনা আহারেই কাটিয়া গেল। মেসের সকলে বলাবলি করিতে লাগিল, এ যে 'বিষম স্বদেশী' হইয়া উঠিল।

পরদিন সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া লইয়া সমরেন্দ্র নিজের শয়ন গৃহের সম্মুখস্থ দালানে রন্ধন সুরু করিয়া দিল। প্রতিজ্ঞা করিল যে এবার হইতে স্বপাক ভিন্ন আর আহার করিবে না। অযত্নে ও নানা অনিয়মে শরীর যে বিশেষ দুর্ব্বল হইয়াছে এবং এত পরিশ্রম যে তাহার সহ্য হইবে না সে বিষয় মনেই আনিল না। চাকরকে সৈন্ধব লবণ গুঁড়া করিতে দিয়াছিল কিন্তু আবার কি ভাবিয়া ফেরত লইয়া দুর্ব্বল হস্তে নিজেই গুঁড়া করিতে বসিল। বাবুর নিকট 'শিল' আনিয়া দিবার সময় চাকর এ বিষয়ে একটু আপত্তি করিয়াছিল কিন্তু সমরেন্দ্র সে কথায় কান দেয় নাই।

"দুর্ব্বল হস্তে নিজেই গুঁড়া করিতে বসিল

নগ্ন পদে মালকোঁচা বাঁধিয়া কাপড় পরিয়া গায়ে হাপ হাতা পাঞ্জাবী লাগাইয়া, মাথায় পাগড়ী বাঁধিয়া সমরেন্দ্র দর্পণে একবার নিজের চেহারা দেখিয়া লইল। ভাবিল এই পরিচ্ছদই প্রকৃত দেশ-ভক্তের পরিচ্ছদ। মেসের বাহির হইতেই দরজাতে অমরের সহিত দেখা হইল। অমর বলিল—"খালি পায়ে যাচ্ছ কেন।" "ভারতের তেত্রিশ কোটী লোকের মধ্যে বত্রিশ কোটী লোকেরই খালি পা" বলিয়া সমরেন্দ্র চলিয়া গেল। অমর দেখিল ক্রমশঃই অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি হইয়া যাইতেছে। নিজের ঘরে আসিয়া সে সবিস্তারে একখানি পত্র লিখিয়া সমরেন্দ্রের পিতার নিকট পাঠাইয়া দিল।

| ৩ |

হরিহরবাবু অমরের পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলেন। গৃহিণীর কাছে গিয়া তাঁহাকে পত্রের বিষয় না জানাইয়া বলিলেন, বৈশাখ মাসেই সমরের বিয়ের ঠিক করা যাক, কি বল। পরীক্ষার সংবাদ বাহির হইলে পর পুত্রের বিবাহ হইবে এইরূপই স্থির ছিল, কিন্তু হঠাৎ কর্ত্তার মত পরিবর্ত্তনের কারণ তিনি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন রমানাথ বাবু কি তোমায় লিখেছেন। 'হ্যাঁ একখানা চিঠি পেয়েছি' বলিয়া হরিহরবাবু বাহির মহলে চলিয়া গেলেন। পুত্রের বিবাহের দিন আরও নিকটবর্ত্তী হইল দেখিয়া গৃহিণী আনন্দ অনুভব করিতে

লাগিলেন এবং কাল বিলম্ব না করিয়া বাটীর অপর সকলকে সে শুভসংবাদ জানাইয়া দিলেন।

রমানাথবাবু ও হরিহরবাবু বাল্যবন্ধু। স্কুলে এবং কলেজে উভয়ে বরাবর একসঙ্গেই পড়িয়াছেন। রমানাথবাবু বিশ বৎসর কাল ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটী করিয়া এক্ষণে বিভাগীয় কমিশনারের পার্শ্বন্যাল এসিষ্ট্যাণ্ট হইয়াছেন। সমরেন্দ্রের সঙ্গে তাহার একমাত্র কন্যা শোভার বিবাহ দিবার প্রস্তাব তিনি অনেক দিন হইতে করিয়া রাখিয়াছেন। হরিহরবাবুও বাল্যবন্ধুর সুশিক্ষিতা সুন্দরী কন্যাকে পুত্রবধূরূপে লইবেন বলিয়া বরাবর সম্মতি দিয়াছেন। শীঘ্রই কন্যার বিবাহ দিতে হইবে এবং কিছু দিন বিশ্রামও করা চাহি বলিয়া রমানাথবাবু ছয় মাসের ছুটি লইয়া সম্প্রতি কলিকাতায় নিজ বাটীতে বাস করিতেছিলেন। হরিহরবাবু তাহাকে একখানি পত্র দিলেন যে তিনি কল্য কলিকাতায় যাইতেছেন।

কলিকাতায় পৌঁছিয়া রমানাথবাবুর সহিত হরিহরবাবুর নানারূপ কথাবার্তা হইল। রমানাথবাবু বলিলেন—ভায়া দুচার বছরের মধ্যে সমস্ত ঠিক হয়ে যাবে, কোন ভাবনা নেই। কেবল এখন কলকাতার হুজুগের মধ্যে থেকে সরিয়ে বাড়ীতে নিয়ে যেতে হবে। উভয়ে সমরেন্দ্রের মেসের দিকে রওনা হইলেন।

তাঁহারা যখন মেসে উপস্থিত হইলেন, তখন সমরেন্দ্র তথায়

ছিল না। অমর উভয়কে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল। রমানাথ-বাবু অমরকে প্রশ্ন করিয়া জানিলেন যে সমরেন্দ্র সম্প্রতি স্বপাক আরম্ভ করিয়াছে। সৈন্ধবলবণ পর্য্যন্ত স্বহস্তে গুঁড়া করিয়া লয়, চাকরদের বিশ্বাস নাই, পাছে তাহারা অন্য লবণ দিয়া তাহার ব্রত ভঙ্গ করে। অযত্নে শরীর দুর্ব্বল করিয়া ফেলিয়াছে। সকল কথা শুনিয়া রমানাথবাবু বলিলেন, সমস্ত ঠিক হইয়া যাইবে। হরিহর বাবু কোন কথা না বলিয়া কেবল একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন।

সমরেন্দ্র স্বদেশী পোষাকে সজ্জিত হইয়া নগ্ন পদে যখন গৃহে প্রবেশ করিল, হরিহরবাবু তাহার দিকে চাহিয়া আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না, বলিলেন "শরীরটা একেবারে মাটি করেচিস্!" হঠাৎ নিজ গৃহে পিতা ও পিতৃবন্ধুকে উপস্থিত দেখিয়া সমরেন্দ্র বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেল। রমানাথবাবু যখন তাহাকে হাত ধরিয়া বসাইলেন, তখন সে তাড়াতাড়ি তাঁহাকে প্রণাম করিল।

[৪]

সমরেন্দ্র পিতার সহিত মহেশপুরে চলিয়া আসিয়াছে। রমানাথবাবু তাহাকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন, স্বদেশের সেবা করিতে চাহ ত পল্লীগ্রামের উন্নতি কর কলিকাতায় থাকিয়া সভার সভায় ঘুরিয়া কেবল বক্তৃতা শুনিলে কিছুই হইবে না। কথাগুলি সমরেন্দ্রের বিশেষ ভাবে মনে

লাগিয়াছে। নিজ গ্রামে আসিয়াই সে বনজঙ্গল পরিষ্কার ও নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপনের আয়োজন করিতে লাগিল। গ্রামের প্রত্যেক প্রজার বাটী গিয়া সমরেন্দ্র সকলকে জানাইল যে প্রতি দিন সন্ধ্যার পর তাহাদের সদরবাটীতে নৈশ-বিদ্যালয় বসিবে, সকলে সেখানে যেন উপস্থিত হয়।

প্রজারা সমরেন্দ্রকে খোকাবাবু বলিয়া ডাকিত। হঠাৎ খোকাবাবু নিজে সকলের বাটীতে পদধূলি দেওয়ায় এবং সকলকে লেখাপড়া শিখাইবার জন্য ব্যস্ত হওয়ায় প্রজাদের মধ্যে বিশেষ আন্দোলনের সৃষ্টি হইল। বৃদ্ধ প্রজারা বলিতে লাগিল, নিশ্চয়ই কোন অভিসন্ধি আছে, তাহা না হইলে যে খোকাবাবু একবার আমাদের দিকে তাকাইতেন না, তিনি প্রত্যেকের বাড়ি বাড়ি আসিবেন কেন? শেষে স্থির হইল, আচ্ছা, আদেশ অমান্য করা ভাল নয়, দেখা যাক কতদূর গড়ায়।

প্রথম দিনকতক নৈশবিদ্যালয়ে যুবা বৃদ্ধ বালক বহু প্রজাই উপস্থিত হইতে লাগিল। অগ্রে কোনরূপ পড়াইবার ব্যবস্থা না করিয়া সমরেন্দ্র কেবল বক্তৃতা দিয়া, পূর্ব্বে আমাদের পল্লীর অবস্থা কিরূপ ছিল, এখন কত অবনত হইয়াছে কিরূপে উন্নতি সাধন করিতে হইবে ইত্যাদি বিষয় বুঝাইতে লাগিল। চার পাঁচ দিন যাইতে না যাইতে ক্রমশঃ লোকের সংখ্যা কমিতে লাগিল। সমস্ত দিন খাটিবার পর অনেকের শরীর এত ক্লান্ত

থাকিত সে খোকাবাবুর বক্তৃতা আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে তাহারাও অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া নাসিকা গর্জ্জন আরম্ভ করিত। ভৃত্য যাইয়া তাহাদের ঠেলিয়া উঠাইয়া দিলে, চোখে মুখে জল দিয়া আসিবার নাম করিয়া সরিয়া পড়িত। দুএক জন বক্তৃতার একটু আধটু বুঝিতে পারিলেও বাকি সকলে কেবল খোকাবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত এবং কতক্ষণে বক্তৃতা বন্ধ হইবে তাহাই চিন্তা করিত। একদিন বক্তৃতার শেষে একজন বৃদ্ধ প্রজা বলিল, খোকাবাবু যদি রামায়ণ পাঠ করেন তাহলে ভাল হয়। আর একজন বলিল, গরীব প্রজাদের জন্যে একটু তামাকের বন্দোবস্ত রাখতে আজ্ঞা করবেন। সমরেন্দ্র বুঝিতে পারিল যে তাহার বক্তৃতায় বিশেষ ফল হইতেছে না, কেবল জমীদার পুত্রকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য জনকতক করিয়া প্রজা প্রত্যহ আসিতেছে মাত্র।

সমরেন্দ্র একদিন বলিল যে, সকলে মিলিয়া গ্রামের বন জঙ্গল পরিষ্কার করিতে হইবে, আপাততঃ গ্রামের প্রধান রাস্তার দুই পার্শ্বে যে সব জঙ্গল আছে তাহা পরিষ্কার করা দরকার। পরদিন হইতেই নৈশবিদ্যালয়ে লোকের সংখ্যা একবারে অনেক কমিয়া গেল। বিজ্ঞ প্রজারা বলিতে লাগিল, আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি কিছু মতলব আছে, দেখিতেছ না বিনা মজুরীতে আমাদের দ্বারা রাস্তার জঙ্গল পরিষ্কার করাইয়া লইবে, আসল কথা এতদিনে

প্রকাশ পাইয়াছে। অপর সকলেও বুঝিল যে খোকাবাবুর বিনা মজুরীতে খাটাইয়া লইবার মতলব।

কয়েকদিন পরে বালক ও যুবকে দশ বারজন প্রজা লইয়া সমরেন্দ্র রাস্তার জঙ্গল পরিষ্কার কার্য্যে লাগিয়া গেল। জমীদার পুত্র নিজে কোদাল কুড়ুল ধরিয়া লাগিয়াছেন, সেজন্য প্রথম দিন উৎসাহে সকলে অনেকটা পরিষ্কার করিয়া ফেলিল। তিন দিন পর্য্যন্ত এইরূপ উৎসাহে কাজ চলিল। চতুর্থ দিবসে অবসন্ন শরীরে কার্য্যস্থলে আসিয়া সমরেন্দ্র দেখিল মাত্র পাঁচ জন উপস্থিত আছে। সে দিন নিজের শরীরটা ভাল ছিল না এবং লোকও বেশী আসে নাই, সুতরাং কার্য্য স্থগিত রহিল। পরদিন বাকি সকলকে ডাকিয়া আনিতে বলিয়া দিয়া সমরেন্দ্র বাটী ফিরিয়া গেল। তাহার অন্তরের উত্তেজনাও অনেকটা কমিয়া আসিয়াছিল।

সমরেন্দ্র বাহিরবাটীতে নিজ ঘরে শুইয়াছিল, পিতাকে আসিতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল। "রমানাথবাবু কাল তোমাকে আশীর্ব্বাদ করতে আসবেন, ১৮ শে বিবাহের দিন স্থির হয়েছে। এ কদিন বনজঙ্গল কাটার কাজ বন্ধ রেখো। বিবাহের সমস্ত কাজকর্ম্ম সমাধা হলে আবার তোমার ইচ্ছামত কাজ আরম্ভ কোরো তাতে কোন আপত্তি নেই" বলিয়া হরিহরবাবু পুত্রের গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। সমরেন্দ্র ভাবিতে লাগিল- বিবাহ করিলে স্বদেশ সেবার ব্যাঘাত

হইবে না ত। ব্যাঘাত হইলে ত আমার কিছুতেই বিবাহ করা উচিত নয়, আমি যে স্বদেশের সেবা জীবনের ব্রত করিয়া লইয়াছি। কেন, ব্যাঘাতই বা কিসের জন্য হইবে, আমাদের দেশের স্বদেশী নেতারা ত সকলেই বিবাহিত। দেশের কাজের অসুবিধা হইলে তাঁহারা কি বিবাহ করিতেন। শোভাকে দুই বৎসর দেখি নাই, সে এখন আরও বড় হইয়াছে, লেখাপড়াও বেশ শিখিয়াছে, তাহার দ্বারা আমরা দেশ সেবার কার্য্যের সুবিধা হইবে বলিয়াই বোধ হয়। উভয়ে মিলিয়া দেশের সেবায় জীবন অর্পণ করিব।

পুত্রের বিবাহে বহু লোকেব সমাগম হইবে বলিয়া হরিহর বাবু গ্রামের প্রধান রাস্তার দুই পার্শ্বের জঙ্গল মজুর লাগাইয়া পরিষ্কার করাইলেন। কতক অংশ সমরেন্দ্র পূর্ব্বেই পরিষ্কার করিয়াছিল বলিয়া কিছু খরচা কম লাগিল। প্রজারা বলিতে লাগিল, খোকাবাবু নিজের বিবাহের জন্য আমাদের দ্বারা সমস্ত জঙ্গল বিনা খরচায় পরিষ্কার করিবার মতলব করিয়াছিলেন। বিবাহের সময় আসিয়া অমর লোক পরম্পরায় প্রজাদের এই কথা শুনিয়া সমরেন্দ্রকে জানাইয়াছিল। সমরেন্দ্র অমরের কাছে দুঃখ করিয়া বলিয়াছিল, "যাদের উন্নতির জন্যে এত চেষ্টা করি, তারাই আমায় সন্দেহ করে। সাধে কি এ সব লোকের এত অবনতি।"

[৫]

বিবাহের পর দুই বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। রমানাথ বাবুর বিশেষ চেষ্টায় সমরেন্দ্র একটি ডেপুটিগিরি কার্য্য পাইয়াছে। তাহার স্বভাবের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। প্রথমে চাপকান পরে গলাবন্ধ কোট গোল টুপি ছাড়িয়া সমরেন্দ্র এখন হ্যাটকোট পরা পুরা সাহেব হইয়াছে। তাহার মনে ধারণা হইয়াছে যে অশিক্ষিত লোকদের শিক্ষা দিয়া উন্নতি করা কিছু নয়, তাহাদের স্পর্দ্ধা ক্রমশঃই বাড়িয়া যাইবে এবং ভদ্রসম্প্রদায়ের বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে। কোন মহকুমার ভার প্রাপ্ত হইলে সে দেখাইবে যে কিরূপে নিম্নশ্রেণীর দেশবাসিগণকে দমন করিতে হয়। অনেক চেষ্টা করিয়াছে কিন্তু শোভাকে কিছুতেই নিজের মনের মত করিয়া লইতে পারিতেছে না, সে কিছুতেই স্বামীর বন্ধুবর্গের সম্মুখে বাহির হইতে পারে না! সমরেন্দ্র বলে—এ সব শিক্ষার দোষ। অনেক বন্ধু পত্নী তাহার সঙ্গে আলাপ করেন, জুতা পরিয়া ভ্রমণেও বাহির হন। শোভাকে একদিন জুতা পরানর জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি করায় সে উত্তর দিয়াছিল "ভারতের তেত্রিশ কোটি লোকের মধ্যে বত্রিশ কোটি লোকেরই খালি পা। আমি মেয়ে মানুষ জুতো পরে কি করবো।" সমরেন্দ্র এই উত্তর শুনিবার পর আর একদিনও শোভাকে জুতা পরিবার কথা বলে নাই।

অমর বি, এল পাশ করিয়া হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করিয়াছে। তাহারও বিবাহ হইয়া গিয়াছে। সম্প্রতি সমরেন্দ্র যে জেলায় বদলি হইয়াছে সে স্থানেই অমরের শ্বশুর কেশব বাবু ওকালতি করেন। উভয়ের বাসা পাশা পাশি থাকায় উভয় পরিবারের স্ত্রীলোকদের মধ্যে বিশেষ সৌহৃদ্য হইয়াছে। অমর সংবাদ পাইয়াছিল যে 'বিষম স্বদেশী' সমরেন্দ্র এক্ষণে 'বিষম বিদেশী' হইয়া পড়িয়াছে। স্বদেশের, স্বদেশবাসীর ও স্বদেশী নেতাদের নিন্দা সর্ব্বদাই তাহার মুখাগ্রে লাগিয়া আছে। বেশভূষা চাল চলন সমস্তই একবারে বিদেশী ভাবাপন্ন হইয়া গিয়াছে। অমর পত্র লিখিলে সময়ের অভাবে উত্তর দিতে সমরেন্দ্রের এক মাস লাগিয়া যায়, সে জন্য উভয়ের মধ্যে পত্র চলাচলও একরূপ বন্ধ ছিল।

[৬]

জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব যখন টাউন স্কুলের সম্মুখ দিয়া টমটম্ হাঁকাইয়া যাইতেছিলেন, সেই সময় কয়েকটী বালক "বন্দে মাতরম্" বলিয়া চীৎকার করিয়াছিল। পুলিস অনেক তদন্ত করিয়া কেশব বাবুর ত্রয়োদশ বর্ষীয় পুত্র সরলকুমার ও অপর একটী বালককে আসামী স্থির করিল। ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার এস্ রায়ের (সমরেন্দ্রের) কোর্টেই আসামিদের বিচার হইবে। এই মকদ্দমা লইয়া ক্ষুদ্র সহরে বেশ একটু আন্দোলনের সৃষ্টি হইল। সকলে বলাবলি করিতে লাগিল, মিষ্টার রায়

বালকগণকে শাস্তি না দিয়া ছাড়িবেন না। কেশব বাবু স্থির করিলেন এই সময় জামতাকে সংবাদ দিলে বিশেষ সুবিধা হইতে পারে। অমর হাইকোর্টের উকিল এবং ডেপুটির বাল্যবন্ধু, তিনি তাহাকে আসিবার জন্য টেলিগ্রাম করিলেন।

অমর ট্রেন হইতে নামিয়াই একবারে কোর্টে গিয়া উপস্থিত হইল। তখন সবেমাত্র আদালত বসিয়াছে, চারিদিকে লোকে লোকারণ্য। সকলেই বিচার ফল জানিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া আছে। মিষ্টার রায় দেখিলেন তাঁহার বাল্যবন্ধু অমর আসামীদের পক্ষ সমর্থনের জন্য উপস্থিত হইয়াছে। অমর বক্তৃতায় বালকদের অল্প বয়স এবং প্রথম অপরাধের বিষয় উল্লেখ করিয়া বিচারকের দয়া প্রার্থনা করিল। যাহাতে কেবল সাবধান করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়, সেজন্যও বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিল। বিচারক রায়ে বলিলেন— ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের পশ্চাতে "বন্দে মাতরম" বলিয়া চীৎকার সামান্য অপরাধ নহে। বিশেষতঃ প্রথম আসামী সরলকুমার এই সহরের একজন স্বদেশী নেতার পুত্র বলিয়া একটু বিশেষ উচ্ছৃঙ্খল। অপর আসামীর পিতা স্থানীয় স্বদেশী ভাণ্ডারের সত্বাধিকারী। উভয় বালকই এক্ষণে বিনা শাস্তিতে মুক্তি পাইলে, ভবিষ্যতে স্বদেশী আন্দোলনকারী হইয়া উঠিবে। আমি তাহাদের মঙ্গলের জন্য এবং অন্য বালকগণকে সাবধান করিবার জন্য আসামীদ্বয়কে সামান্য দণ্ড দিলাম। প্রত্যেককে

১০ বার করিয়া বেত্রাঘাত করা হইবে। রায় পাঠ শেষ হইলে "কি ভীষণ পরিবর্ত্তন" বলিয়া অমর আদালত গৃহের বাহির হইয়া আসিল। তখন বাহিরের জনসঙ্ঘ বলাবলি করিতেছিল "প্রাণে একটুও দয়ামায়া নেই—কি নিষ্ঠুর!"

মুহূর্ত্ত মধ্যে দণ্ডের সংবাদ ক্ষুদ্র সহরের সর্ব্বত্র প্রচার হইয়া পড়িল। সরলকুমার শোভাকে দিদি বলিয়া ডাকিত, শোভাও তাহাকে কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় ভালবাসিত। শোভা দণ্ডের কথা শুনিয়াই কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার স্বামী যে কি করিয়া এমন নিষ্ঠুর হইয়া পড়িয়াছেন, তাহা সে বুঝিতে পারিল না।

সমরেন্দ্র স্বদেশী আসামীর দণ্ড দিয়া বীর দর্পে গৃহে প্রবেশ করিতেই শোভা অশ্রুসিক্ত নয়নে তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল—"তুমি কি নিষ্ঠুর, তোমার প্রাণে কি একটুও মায়া মমতা নেই।" সমরেন্দ্র কি উত্তর দিবে ঠিক করিতে পারিল না।

রাত্রে আহারাদি শেষ করিয়া সমরেন্দ্র খাটের উপর শুইয়া কত কি ভাবিতেছিল। শোভা ধীরে ধীরে ঘরে প্রবেশ করিয়া মেঝেতে একখানি মাদুর পাতিয়া শুইয়া পড়িল। সমরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল—তুমি যে ওখানে শুলে। শোভা বলিল—"দেশের যে শতকরা নব্বুই জনের মাটিতে শয্যা।" কথাগুলি সমরেন্দ্রকে বৃশ্চিকের ন্যায় দংশন করিল।
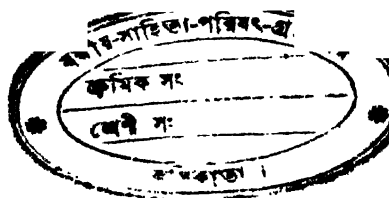
কলির কানাই

[১]

বৃন্দাবনপুরের আনন্দ ঘোষের পুত্র কানাই ঘোষের মাথাটার মধ্যে যে একটু গোলমাল ছিল, সে কথা তাহার পিতা মাতা স্বীকার না করিলেও অপর সকলেই জানিত। গোপ-পল্লীর মধ্যে আনন্দ ঘোষের অবস্থাই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল ছিল। একসঙ্গে বিশ পঁচিশটি দুগ্ধবতী গাভী যখন তাহার গোয়াল হইতে গ্রামের পথে বাহির হইত, তখন কেহই তাহার সৌভাগ্যের কীর্ত্তন না করিয়া থাকিতে পারিত না। দুগ্ধের ব্যবসায়ে আনন্দ ঘোষের যে আয় হইত, তাহার সামান্য অংশ মাত্র ক্ষুদ্র সংসারের জন্য ব্যয় হইয়া বাকি সমস্তই সঞ্চয়ের মাত্রা বৃদ্ধি করিত। আনন্দের সংসারে পত্নী মানদা ও একমাত্র পুত্র কানাই ব্যতীত অন্য কেহ ছিল না। অধিক বয়সের একমাত্র সন্তান বলিয়া পিতামাতার নিকট কানাইয়ের আদরের অন্ত ছিল না, ছেলের কোনরূপ খেয়ালই তাহারা অপূর্ণ রাখিত না। কানাইএর খেয়ালের জন্য প্রতিবেশীদেরও একটু আধটু অসুবিধা ভোগ করিতে হইত; কিন্তু ধনীর আদরের সন্তানের বিরুদ্ধে কোন কিছু বলা কেহ সুবিধা বলিয়া মনে করিত না।

পুত্রের বয়স ১৫।১৬ বৎসর হইলেও তাহার কোনই পরিবর্ত্তন দেখা গেল না। বয়সের সঙ্গে খেয়ালের মাত্রা বরং বৃদ্ধিই পাইতে লাগিল। গোপপল্লীর অন্যান্য বালক বালিকারা ৭।৮ বৎসর হইতেই পিতামাতার কার্য্যের কত সাহায্য করিতেছে তাহা আনন্দ ঘোষ নিত্যই চক্ষের সম্মুখে দেখিত। গরু চরাইয়া আনা, দুগ্ধ যোগান দেওয়া, গোয়াল পরিষ্কার করা প্রভৃতি প্রত্যেক কার্য্যই বালক বালিকারা আনন্দের সহিত সম্পাদন করিতেছে দেখিয়া আনন্দ ঘোষ নিজের মনকে সান্ত্বনা দিত যে, তাহার বেতনভোগী লোকজনে যখন সকল কাজ করিতেছে, তখন কানাই এ দিকে মন না দিলেই বা ক্ষতি কি? ভাবনা হইত ভবিষ্যতের জন্য, তাহার অবর্ত্তমানে কিরূপ হইবে। ছেলেকে একটু লেখা পড়া শিখাইলে সুবিধা হইতে পারে, সে নিজ হস্তে কাজ না করিলেও শিক্ষার গুণে লোক-জন খাটাইয়া সে ব্যবসা চালাইতে পারিবে এবং সুখে থাকিবে ইহা নিশ্চিত। মনে মনে ইহা স্থির করিয়া আনন্দ ঘোষ একমাত্র বংশধর আদরের কানাইকে শিক্ষার জন্য সহরে পাঠাইয়া দিল।

[২]

মাস ছয়েক সহরে কাটাইয়া কানাই হঠাৎ একদিন গ্রামে ফিরিয়া আসিল। "মা মা" করিয়া বাটীতে প্রবেশ করিতেই মানদা

বন্ধন ফেলিয়া ছুটিয়া আসিল। মাতাকে কোন কথা বলিতে অবসর না দিয়াই কানাই বলিল, "মা তোমার নাম মানদা নয়, যশোদা!" মানদা বলিল; "আচ্ছা বাবা তোর যা ইচ্ছে তাই। আমাকে ছেড়ে সহরে কেমন ছিলি বল্ ত!" কানাই সে কথার উত্তর না দিয়া বলিল, "বাবার নাম আনন্দ নয়, নন্দ। আমি যখন কানাই, তখন আমার মা'র নাম যশোদা আর বাবার নাম নন্দ ছাড়া অন্য কিছু হ'তে পারে না।" বলিয়াই দৌড়িয়া বাটীর বাহির হইয়া গেল। মানদা তাহার খেয়ালী পুত্রের নূতন খেয়ালের কথা শুনিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না।

আনন্দ ঘোষ টাকা আদায় করিয়া বাটীতে ফিরিতেছিল। রাস্তার সম্মুখেই কানাইকে ছুটিয়া যাইতে দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। হঠাৎ ফিরিয়া আসিবে ইহা তাহার ধারণাই ছিল না। কানাই পিতাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিল, "বাবা মা'র কাছ থেকে জান্তে পার্বে তোমার নাম বদ্‌লে গেছে!" আনন্দ পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কানাই অনেকদূর চলিয়া গিয়াছে।

গ্রামের প্রধান পথে উপস্থিত হইয়া কানাই স্ত্রী-পুরুষ যাহাকেই দেখিতে পাইল বলিল—এ গাঁয়ের নাম বৃন্দাবন, "বৃন্দাবনপুর" নয়! আমার নাম যখন কানাই, আমার মা

বাবার নাম যখন যশোদা আর নন্দ, তখন এ গাঁয়ের নাম নিশ্চয়ই বৃন্দাবন। সকলেই জানিল যে সহর হইতে ঘুরিয়া আসিয়া আনন্দ ঘোষের একমাত্র আদরের পুত্রের মাথার গোলমাল আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

সহরে যাত্রা থিয়েটারে কৃষ্ণ-লীলার অভিনয় দেখিয়া কানাই এর মাথার ভিতরটা কিরূপ হইয়া গিয়াছিল। হঠাৎ সে নিজেকেই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছে। মানদা ছেলের জন্য হলুদে কাপড় রঙ্গাইয়া একখানি পীত-বসন করিয়া দিয়াছিল। কানাই সেখানি যাত্রার শ্রীকৃষ্ণের ধরণে পরিয়া হস্তে একটি বাঁশী লইয়া আসিয়া বলিল, "মা আজ থেকে তোমায় মা-যশোদা বলে ডাক্‌বো, বুঝলে!" মানদা বলিল "তোর যা ইচ্ছে বাবা তাই বলিস্।" কথা শেষ হইতে না হইতেই কানাই বলিল, মা-যশোদা আমায় "শিখী-পাখা চূড়া" পরিয়ে দাও। "কি বলিস্ যে তোর কথা আমি বুঝতে পারি না।" "তবেত ভারি মা-যশোদা, শিখী পাখা চূড়া— ময়ূরের পালকের চূড়ো জানো না। আমি চল্লুম যোগাড় করতে। তোমার কায নয় দেওয়া।

সমস্ত গ্রাম ঘুরিয়া কোথাও একটি ময়ূরের পালক জুটিল না। কোথায় বা পাওয়া যাইবে, এ জিনিষ ত কাহারও আর আবশ্যকীয় জিনিষ নয়, যে লোকে সঞ্চয় করিয়া রাখিবে।

কানাই অনেক চিন্তার পর স্থির করিল যে, সে হাঁসের পালক দিয়াই শিখী-পাখা চূড়া বাঁধিবে। গ্রামে হাঁসের অভাব নাই। রাস্তার ধারেই প্রতিবেশীদের একপাল হাঁস চরিতেছিল, কানাই পালক লইবার জন্য তাহারই একটাকে ধরিয়া ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গে বহু ভীত কণ্ঠে প্যাঁক্ প্যাঁক্ প্যাঁক্ শব্দ উত্থিত হইল। যাহার হাঁস সে দৌড়িয়া আসিল, দেখিল যে কানাই একটি হাঁস লইয়া পলাইতেছে। অগত্যা তাহাকেও পশ্চাদ্ধাবন করিতে হইল। কানাই ছুটিতে ছুটিতে একেবারে গ্রামের প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইল, ফিরিয়া দেখিল যে, যাহার হাঁস সেও প্রায় তাহার নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে। আর উপায় নাই, হাঁসটি ছাড়িয়া দিয়া কানাই দৌড়িয়া গো-ভাগাড়ের দিকে পলায়ন করিল। গো-ভাগাড়ে পৌঁছিয়া ভীতি নিবারণ এবং তৎসঙ্গে আকাঙ্ক্ষিত বস্তুও লাভ হইল। ভাগাড়ে অনেক শকুনের পালক পড়িয়াছিল, তাহা হইতে একটি বাছিয়া লইয়া কানাই গৃহে ফিরিল।

শকুনের পালকের 'শিখী-পাখা চূড়া' পরিয়া পীতবসন ও বন ফুলের মালায় সাজিয়া, এক পাল গরু লইয়া যখন কানাই গ্রামের পথে বাহির হইল, তখন স্ত্রী-পুরুষ বালক বালিকা কেহই এই কলির কানাইকে দেখিয়া হাস্য সংবরণ করিতে পারিল না। তাহাকে দেখিতে পথে লোকের ভিড় যতই বাড়িতে লাগিল

তাহার স্ফূর্ত্তিও ততই চড়িতে সুরু করিল। কানাই নাচিতে নাচিতে গান ধরিল—

"আমি বৃন্দাবনে বনে বনে ধেনু চরাবো।
খেলব কত ছুটা ছুটি বাঁশী বাজাবো॥
খেলতে বড় ভালবাসি,
ছুটে ছুটে তাইতে আসি,
আমার মনের মতন খেলার জুটি
কতজন পাবো॥"

সত্য সত্যই কানাইএর মনের মত খেলার জুটি অনেক জুটিয়া গেল। অনেক বালক বালিকাও তাহার সহিত নাচিতে নাচিতে ধেনু তাড়াইতে তাড়াইতে গো-চারণ মাঠে আসিয়া উপস্থিত হইল।

শ্রীকৃষ্ণ কদম্ব গাছের উপর বসিয়া বাঁশী বাজাইতেন। কানাইকেও সেইরূপ করিতে হইবে। মাঠের ধারে একটি অশ্বত্থ গাছ ছিল, ক্লান্ত পথিক ও রাখালেরা তাহার ছায়ায় বসিয়া বিশ্রাম লাভ করিত। কানাই কদম্বের পরিবর্ত্তে সেই অশ্বত্থ গাছে উঠিয়াই বাঁশী বাজাইতে আরম্ভ করিয়া দিল। "এ কি রকম কেষ্ট ঠাকুর, কদম/গাছের বদলে অশথ গাছে চড়ে বাঁশী বাজায়" বলিতে বলিতে গোপ বালক বালিকারা গাছের নীচে চীৎকার ও নৃত্য করিতে লাগিল।

কলির কানাই

[৩]

একদল ছেলে সঙ্গে করিয়া অপরূপ বেশে কলির কানাইএর ধেনু চরান ও অশ্বত্থ গাছের উপর হইতে বাঁশী বাজান নিয়মিত ভাবেই চলিতে লাগিল। দিন কতক পরে সেই গাছের ডালে আবার এক দোলনা ঝুলান হইল। ছেলেদের আনন্দ আরও বাড়িয়া গেল, তাহারা সকলে পালা করিয়া কানাইকে দোল খাওয়াইতে লাগিল। এক দিন কানাইএর মনে এক খেয়ালের উদয় হইল—একা দোল খাওয়া কিছুই নয়, রাইকিশোরী না হইলে কানাইএর দোল খাওয়া কি মানায়। মনে হওয়া মাত্রই তৎক্ষণাৎ সে দোলনা হইতে নামিয়া গ্রামের দিকে ছুটিল। যেমন করিয়াই হউক তাহার খেয়াল পূর্ণ করিতে হইবে। খানিক দূর গিয়া দেখিল, রাসেশ্বরী ঘাটে বাসন মাজিতেছে। কানাই ভাবিল, রাসেশ্বরী ও রাইকিশোরী ত একই, তবে ত ঠিক পেয়েছি। নিকটে গিয়া কোন কথা না বলিয়া গান ধরিয়া দিল—

"রাই তোর হৃদয় কি পাষাণ।

একবার দেখলিনে শ্যাম যায়, ফিরে যায়

হ'য়ে ম্রিয়মাণ।"

রাসেশ্বরী পিছন ফিরিয়া একখানা বাসন মাজিতেছিল, গানের শব্দে ফিরিয়া দেখিল—কানাই। "রকম দ্যাখোনা যেন একটা সং" বলিয়া বাসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কানাই সে

কথার কোন উত্তর না দিয়া তাহার মুখের কাছে হাত নাড়িয়া আবার গান ধরিল—

"রাই তোর হৃদয় কি পাষাণ"

"আমার নাম কি রাই যে আমার মুখের কাচে হাত নাড়চো।"

"রাই না তো কি? ও রাসেশ্বরীও যা রাইকিশোরীও তাই—তা জানিস্।"

"বড্ডো বলেচে—তুই নাকি এক।"

"নিশ্চয়ই এক।"

"এক তো এক—তা আমার বয়ে গেল।"

"বয়ে গেল বল্লে হবেনা, আমার সঙ্গে যেতে হবে তোকে দোলনায় দুল্‌তে।"

"আমার দায় পড়েচে, কক্‌খোনো যাবো না।"

"যাবি না, তোকে টেনে নিয়ে যাবো"—বলিয়া কানাই যেই রাসেশ্বরীকে ধরিতে গেল, অমনি সে "বাবা গো" বলিয়া বাটীর দিকে দৌড়িয়া পলাইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে কোথা হইতে একজন লোক বাহির হইয়া কানাইএর পৃষ্ঠে বাঁকের দ্বারা এক প্রচণ্ড আঘাত করিল। সেই এক আঘাতেই চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিয়া কানাই সেখানে পড়িয়া গেল।

কানাই যখন সর্ব্ব প্রথমে রাসেশ্বরীর নিকট আসিয়া দাঁড়ায়, তখনই তাহার পিতা দামোদর ঘোষ দূর হইতে কানাইকে

'কানাই এর পৃষ্ঠে বাঁকের দ্বারা এক প্রচণ্ড আঘাত করিল

দেখিতে পাইয়াছিল। তাহার দ্বাদশ বর্ষীয়া বিবাহযোগ্যা কন্যার সঙ্গে কানাই যে হাত মুখ নাড়িয়া কথা কহিতেছে এবং কন্যাও মুখভঙ্গি করিয়া উত্তর দিতেছে; ইহা তাহার ভাল লাগিতেছিল না। যদি কিছু বিসদৃশ দেখা যায় তাহা হইলে ধনী সন্তান বলিয়া তাহার সে বেয়াদবী সহ্য করা হইবে না স্থির করিয়া, দামোদর আপনার বাঁকখানা লইয়াই অন্তরাল দিয়া তাহাদের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। যখন প্রায় নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, শুনিল—কানাই বলিতেছে "যাবি না, তোকে টেনে নিয়ে যাবো।" শুনিয়াই তাহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। "বাবা গো" বলিয়া রাসেশ্বরী যে সময়ে দৌড়িয়া বাটীর দিকে পলাইয়া গেল, ঠিক সেই সময় দামোদর পশ্চাৎ দিক হইতে কানাইকে আঘাত করিল। আঘাতের চোটে কানাই অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া যাওয়ায় তাহার বিশেষ ভয় হইয়াছিল। মুখে চোকে জল দিতে দিতে যখন কানাইএর জ্ঞান হইবার উপক্রম হইল, তখন দামোদর সরিয়া পড়িল।

জ্ঞান হইলে বেদনা-কাতর দেহ ও ধুলামাখা পীতবাস লইয়া কানাই উঠিয়া দাঁড়াইল। পরে ধীরে ধীরে অশ্বত্থ তলায় উপস্থিত হইয়া দেখিল, তাহার "খেলার জুটি" অন্যান্য গোপ বালকেরা হাজির রহিয়াছে। কানাইকে দেখিয়াই সকলে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল—'কানাই দাদা আজ আমরা তোমায়

খুব দোল খাওয়াবো!" কানাই দমিবার পাত্র নয়, আস্তে আস্তে দোলনায় উঠিয়া বসিয়া বলিল, "জোরে দিস্‌নি আস্তে দোল দে।" 'আচ্ছা তাই দোবো' বলিয়া সকলে দোল দিতে সুরু করিয়া দিল। ক্রমে দোলের মাত্রা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কানাইএর পূর্ব্ব হইতেই মাথাটা টল মল করিতেছিল। তাহার বার বার কাতর নিষেধ সত্ত্বেও দোলের মাত্রা এতদূর বৃদ্ধি পাইল যে, সে নিজেকে আর ঠিক রাখিতে পারিল না। সবেগে মাটিতে পড়িয়া গেল।

একমাস শয্যাগত থাকিয়া চিকিৎসার পর কানাই যখন আরোগ্য লাভ করিল, তখন সকলে দেখিল যে, তাহার মাথার গোলমাল একেবারে সারিয়া গিয়াছে। কিন্তু পতনের ফলে একদিকের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমূহ চিরকালের জন্য বক্রভাব ধারণ করিয়াছে।

কানাইকে যদি কেহ দেখিতে চান, বৃন্দাবনপুরে যাইলে দেখিতে পাইবেন। এখন সে বৃদ্ধ হইয়াছে। বাঁকা-কানাই বলিলেই গ্রামের যে কেহ তাহার সন্ধান বলিয়া দিবে।

খুড়োর বরাত

[১]

খুড়োমহাশয় যে চুপ করিয়া শুইয়া আছেন, একথা আমরা জানিতাম না। জানিলে কখনই তাঁহার নিকটে বসিয়া পরামর্শ আঁটিতাম না। কথা শেষ করিয়া আমরা দুইজনে অন্ধকার বৈঠকখানা ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইব, এমন সময় খুড়ো-মহাশয় বলিয়া উঠিলেন—"আমাকে সঙ্গে নিও, তোমাদের অনেক সুবিধে হবে। আর তোমরা উপযুক্ত ভাইপো থাকতে আমার যদি না কাশী দেখা হয়, তা হলে জন্মটাই বৃথা বলতে হবে।"

মণি বলিল—"খুড়োমশাই দেখচি বেশ মজার লোক, চুপটি করে পড়ে আচেন, একটু সাড়াও দিতে নেই। আমরা মনে করেছিলুম ঘরে কোন লোক নেই।" আমি বলিলাম—"খুড়ো-মশাই এবারে আর আপনাকে নিয়ে যেতে পারবো না। এখন রেলে কন্‌সেশন্ নেই, তার ওপর সেকেণ্ড ক্লাশ ছাড়া ভদ্র-লোকের যাওয়া পোষায় না। আপনি আমি দুজনে যেতে গেলে অনেক খরচ হয়ে যাবে। আপনাকে আসচে বছর নিয়ে যাবো। ততদিনে আবার রেলের কন্‌সেশন্‌ও আরম্ভ হবে।"

খুড়োমহাশয়ের কোন উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই আমরা দুইজনে বাহির হইয়া গেলাম।

মণিকে খানিক দূরে আগাইয়া বাড়ি ফিরিতেই খুড়োমহাশয় আমাকে ধরিয়া বসিলেন, যে তাঁহাকে সঙ্গে লইতেই হইবে। আমি তাঁহাকে অনেক করিয়া বুঝাইলাম যে এখন ভাড়া খুব বেশী, আর আমি কাশীতে মণির শ্বশুর বাড়ি গিয়া উঠিব, সেখানে দুজনে যাওয়া ভাল দেখায় না। বিশেষ বাড়িতেও একজন পুরুষ থাকা দরকার। অনেক কথাই বলিলাম, কিন্তু কিছুতেই খুড়োমহাশয়ের মন ফিরিল না। তিনি বলিলেন, "সতীশ, আমাকে সঙ্গে নিলে তোমাদের খুব সুবিধে হবে, তোমরা যেখানেই যাও বিদেশ বোলে বুঝতে পারবে না। সমস্ত ভার, আমার ওপর দিয়ে তোমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারবে।" সব ঠিক কথা কিন্তু এবছর আর নিয়ে যাবার উপায় নেই খুড়োমশাই, বলিয়া আমি উঠিয়া পড়িলাম। আমার বরাতে থাকে ত যাওয়া হবে, বলিয়া খুড়োমহাশয় আবার তক্তাপোষের উপর শুইয়া পড়িলেন।

চব্বিশ বৎসর বয়স হইল কলিকাতার পশ্চিমে একবার শ্রীরামপুর ব্যতীত আর কোথাও যাই নাই। ছেলেবেলায় স্কুলের ছেলেদের কাছে কাশী, গয়া, দিল্লী, আগ্রার কত গল্প শুনিতাম, তখন হইতেই মনে বিদেশ ভ্রমণের একটা প্রবল ইচ্ছা জাগিয়াছিল। কিন্তু কখনও কোন সুযোগ ঘটে নাই।

ষড়-অবতার

বিশ্ববিদ্যালয়ের হাত এড়াইয়া গতবর্ষে যখন মণি ও আমি গভর্মেণ্ট অফিসে কর্ম্ম লইলাম তখনই স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম যে আগামী পূজার বন্ধে দুইজনে পশ্চিম ভ্রমণে যাইব। কয়দিন হইল মাকেও বেশ করিয়া বুঝাইয়া রাজি করিয়াছি। মণির শ্বশুরবাড়িতে গিয়া উঠিব, কোন কষ্ট হইবে না, জানিয়া তিনি অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। কিন্তু কাশী হইতে যে আরও অন্য জায়গায় যাইবার ইচ্ছা আছে সে কথা কাহারও নিকট ঘুণাক্ষরে প্রকাশ করি নাই।

খুড়োমহাশয়কে সঙ্গে লইলে আমাদের ভ্রমণ যে বিশেষ আনন্দের হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না। তাঁহার ন্যায় আমোদপ্রিয় লোক কমই দেখা যায়। অল্পক্ষণের মধ্যে নিতান্ত অপরিচিত লোককেও আপনার করিয়া লইবার তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমতা। সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি সকল বিষয়ের আলোচনাতেই তিনি সমান পটু। সকলপ্রকার রন্ধনেও সিদ্ধ হস্ত, কোথাও প্রীতি-ভোজের ব্যবস্থা হইলে সকলে আগে খুড়োমহাশয়ের সন্ধান করে। নিজে কখনও বিবাহ না করিলেও, সংসারের খুটিনাটি পর্য্যন্ত তাঁহার অজানা নাই। সঙ্গে থাকিলে খুব ভালই হয়, কিন্তু কি করিব, কেবল কাশী পর্য্যন্ত হইলে না হয় লইয়া যাইতাম। অন্য জায়গায়ও যে যাইব, অনেক খরচ পড়িবে।

খুড়োর বরাত

যাহারা ছেলেবেলা হইতেই নানাদেশ ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন তাঁহারা কিছুতেই বুঝিতে পারিবেন না যে, পরিণত বয়সে প্রথম বিদেশে যাত্রায় কিরূপ আনন্দ। তিনদিন ধরিয়া কেবল গোছগাছই করিতে লাগিলাম। অনেকে হয়ত হাসিবেন যে, কাশী যাইবে তার আবার এত ব্যাপার, তিন দিন ধরিয়া গোছগাছ। কিন্তু হাসিলে কি হয়, অনেকে এবয়সে হয়ত পাঁচ সাতবার কাশী কেন দিল্লী লাহোর ঘুরিয়া আসিয়াছেন, আর আমার এই যে প্রথম পশ্চিম যাত্রা। কখন বাড়ী ছাড়িয়া বাহির হইব, মনে কেবলই তাহারই চিন্তা জাগিতে লাগিল।

[১]

সমস্ত জিনিষপত্র তুলিয়া দিয়া ভাড়াগাড়ির ভিতরে উঠিয়া বসিলাম। মা গাড়ির নিকটে আসিয়া, বিশেষ সাবধানে থাকিতে, পৌঁছিয়াই চিঠি দিতে এবং শীঘ্র বাড়ী ফিরিতে বলিয়া দিলেন। সমস্তই তাঁহার আদেশমত করিব বলিয়া, গাড়ি হাঁকাইতে বলিলাম। মণিকে তাহার বাড়ী হইতে উঠাইয়া লইয়া যথা সময়ে হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। পূর্ব্ব হইতেই আমরা পাঞ্জাব মেলে দুইটী সেকেণ্ড ক্লাস বার্থ রিজার্ভ করিয়া রাখিয়াছিলাম, সেজন্য গাড়ীতে কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হইল না।

গাড়ীতে উঠিয়া আমরা দুইটি লোয়ার বার্থ দখল করিলাম। পূর্ব্ব হইতেই আর একটি হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক অপর লোয়ার বার্থ এবং তাঁহার পুত্র একটা আপার বার্থ দখল করিয়া বসিয়াছিলেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, তাঁহারাও কাশী যাইবেন। আমরাও সেখানেই যাইতেছি শুনিয়া তিনি আনন্দিত হইলেন।

কিছুক্ষণ পরে আর একটি মুসলমান ভদ্রলোক আসিয়া অপর বার্থটি দখল করিলেন। সকলে মিলিয়া নানারূপ কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। পাচ মিনিটের ঘণ্টা পড়িয়া গিয়াছে, ট্রেণ প্রায় ছাড়ে ছাড়ে। মণি দরজার ধারে দাঁড়াইয়া প্লাটফরমের দিকে দেখিতেছিল, এমন সময় "এই যে, মণি এখানে" বলিয়া খুড়োমহাশয় শশব্যস্তে দরজা ঠেলিয়া আমাদের গাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন। আমি ত তাঁহাকে দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম। ট্রেণ ছাড়িয়া দিল।

মণি বলিল, খুড়োমশাই ব্যাপার কি বলুন দেখি? খুড়ো-মহাশয় আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "সতীশ যে একেবারে বাকশক্তি রহিত হোয়ে গেলে দেখচি। বাবা, বরাতে থাকলে কি কেউ কখনও খণ্ডন করতে পারে। তোমাদের কত করে সাধলুম তোমরা সঙ্গে নিলে না, এখন দেখ নিজেই এসে হাজির হয়েচি।" আমি বলিলাম—এসে ত হাজির হলেন,

টাকা কোথায় পেলেন? খুড়োমহাশয় বলিলেন, "বাবা রাগ কোরো না, তোমার টাকা নিয়েই এসেচি।" আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

খুড়োমহাশয় কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিতে লাগিলেন—যখন তোমার জিনিষ পত্র ভাড়াগাড়িতে উঠান হইতেছিল, তখন আমি বৈঠকখানায় বসিয়া এক মতলব আঁটিয়া ফেলিলাম। গাড়ী চলিয়া গেলে যখন তোমার মা চোখ মুছিতে মুছিতে ভিতরে প্রবেশ করিতেছিলেন, তখন আমি ঘর হইতে বাহির হইয়া সম্মুখে আসিয়া বলিলাম—"বৌদিদি সতীশকে একলা যেতে দিয়ে কাজটা বড় ভাল করলে না।" "ঠাকুরপো আমার কি ইচ্ছে যে তাকে বিদেশে যেতে দি" বলিয়া তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। দেখিলাম সময় মতই ঘা দিয়াছি। বলিলাম, "সেই জন্যেই ত তাকে বলেছিলুম, যে ছেলে মানুষ বিদেশে যাবে আমায় সঙ্গে নাও, তা সে কিছুতেই রাজি হো'ল না।" জান ত যতই বয়স হোক না কেন মার কাছে সকল ছেলেই ছেলেমানুষ। বৌদিদি পরে বলিলেন—ঠাকুরপো তোমাকে তার সঙ্গে যেতেই হবে, এখনো ত অনেক সময় আচে, তাড়াতাড়ি দুটি খেয়ে নাও। আমি বলিলাম, হাঁ এখনো এক-ঘণ্টার বেশী সময় আচে। আমার খাওয়ার যোগাড় করিতে তিনি ভিতরে চলিয়া গেলেন। আমিও নিঃশব্দে খানিকটা

হাসিয়া লইয়া তৎক্ষণাৎ চাকরকে একখানি গাড়ী আনিতে বলিয়া দিলাম।

খাওয়া শেষ হইলে বৌদিদি বলিলেন, ঠাকুরপো, কত দিতে হবে? আমি বলিলাম, কাশী যেতে সেকেণ্ড ক্লাসের একপিঠের ভাড়া কুড়ি টাকা, যাওয়া আশা চল্লিশ টাকা, পথ খরচও কিছু লাগবে, আর দু পাঁচ টাকা হাতে থাকা চাই, মোট গোটা পঞ্চাশেক টাকা হোলেই চলবে। বৌদিদি পাঁচ খানি দশটাকার নোট আমার হাতে আনিয়া দিয়া বলিলেন, সতীশ আমার কাছে তিনশো টাকা রেখেছিল, তাই থেকেই তোমায় দিলুম।

একখানি কম্বল ও বালিশ লইয়া গাড়িতে উঠিয়া জোরে হাঁকাইতে বলিলাম, ষ্টেশনে যখন পৌঁছিলাম তখন ট্রেণ ছাড়িবার পাঁচ মিনিটের ঘণ্টা পড়িল। টিকিট করিয়াই প্লাটফরমের দিকে ছুটিলাম, দূর হইতেই এই গাড়ির দরজায় মণিকে দেখিতে পাইয়াছিলাম। এত তাড়াতাড়ি করিয়া না আসিলে নিশ্চয়ই যাওয়া হইত না, বরাত জোর তাই একটুর জন্য ট্রেণ ধরিতে পারিয়াছি।

খুড়োমহাশয়ের কথা শুনিয়া রাগে আমার সর্ব্বশরীর জ্বলিতে লাগিল। মাকে কথার চাতুরীতে ভুলাইয়া তিনি আমাদের সঙ্গী হইয়াছেন। মায়ের উপরও যে রাগ হইতেছিল না তাহা

নহে। তিনি কেন আমার টাকা দিলেন। শেষে ভাবিলাম, মায়ের কি দোষ, তিনি অতিরিক্ত স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়াই এইরূপ ভুল করিয়াছেন। দোষ যত খুড়োমহাশয়েরই, আমি আর কোন কথা না কহিয়া, শুইয়া পড়িলাম। খুড়োমহাশয়কে যে স্থানাভাবে সমস্ত রাত্রি আমার পদতলে বসিয়া কাটাইতে হইবে, সে বিষয় আর আমি বিবেচনার মধ্যে আনিলাম না। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে আমি রাগিয়াছি।

অর্দ্ধরাত্রে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। খুড়োমহাশয়কে দেখিতে পাইলাম না, হিন্দুস্থানী ভদ্রলোকটি বসিয়াছিলেন, তাঁহার পুত্রটা সেই বেঞ্চেই শুইয়াছিল। তাঁহার দিকে ফিরিতেই তিনি বলিলেন, বাবুজী, ডাগ্‌দার বাবু উপরমে শুয়া হ্যায়। চাহিয়া দেখি খুড়োমহাশয় উপরের বার্থে আরামে ঘুমাইতেছেন। বুঝিতে পারিলাম যে তিনি হিন্দুস্থানী ভদ্রলোকের কাছে নিজেকে ডাক্তার বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন এবং কোন নূতন ফন্দিতে উপরের বার্থটা দখল করিয়াছেন।

[৩]

কাশীতে পৌঁছিয়া যখন রাগ কমিয়া গেল, তখন খুড়োমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম, যে যারা আগে থেকে বার্থ রিজার্ভ করে দখল করেছিল, আপনি ট্রেণ ছাড়বার শেষ মুহূর্ত্তে এসে কি করে তাদের বেদখল করালেন। হিন্দুস্থানি ভদ্রলোকটী সমস্ত

রাত্রি বোসে কাটালেন, আর আপনি ত আরামে ঘুমিয়ে এলেন। খুড়োমহাশয় বলিতে লাগিলেন—তোমরা ত যে যার যায়গায় ঘুমাইয়া পড়িলে, দেখিলাম যে আমাকে বোধ হয় সমস্ত রাত এইরূপ বসিয়াই কাটাইতে হইবে। হিন্দুস্থানী ভদ্রলোকটীর সহিত আলাপ করিয়া জানিলাম, তিনি একজন নামজাদা পাটের দালাল, পুত্রের মাসখানেক হইল হাঁপানির মত হইয়াছে, সেজন্য তিনি তাহাকে বাটীতে রাখিয়া আসিতে যাইতেছেন। কাশীতে কচুরী গলিতে তাঁহাদের বাটী। ছেলের অসুখের কথা শুনিয়া, আমি নিজেকে একজন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার বলিয়া পরিচয় দিলাম এবং কাশীতে রোগী দেখিতে যাইতেছি একথাও তাঁহাকে বলিলাম। ডাক্তার শুনিয়া তিনি তাঁহার ছেলের অসুখ সম্বন্ধে আমাকে নানারূপ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, আমিও বিশেষ বিবেচনার সহিত সকলগুলির উত্তর দিলাম। অল্পক্ষণ পরে হঠাৎ তাঁহার পুত্রটির ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়া, হাঁপানি আরম্ভ হইল। ভদ্রলোকটী বিশেষ ব্যতিব্যস্ত হইয়া আমার সাহায্য চাহিলেন। আমিও সুযোগ বুঝিয়া উপর হইতে বালককে নামাইতে বলিলাম এবং আর যেন উপরে উঠিতে না দেন সেজন্য নিষেধ করিয়া দিলাম। নীচে নামিয়াই অল্পক্ষণ পরে বালকের হাঁপানি বন্ধ হইল এবং ভদ্রলোকটীও অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন। পুত্রকে নীচেই শুইতে দিয়া তাঁহাকে উপরে উঠিতে বলিলাম, কিন্তু

তিনি নিজের বিশাল বপু লইয়া কিছুতেই উঠিতে পারিবেন না, ইহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলাম। ভদ্রলোকটী শেষে আমাকেই উপরে উঠিতে অনুরোধ করিলেন এবং তিনি পুত্রের নিকটে বসিয়া রাত কাটাইবেন স্থির করিলেন। আমিও প্রথমে দুই চারিবার মৌখিক অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া; যথা সময়ে উপরে উঠিয়া শয়ন করিলাম। আগে হইতে বার্থ রিজার্ভ করিয়া হিন্দুস্তানী ভদ্রলোকটী সমস্ত রাত বসিয়া কাটাইলেন, আর আমি শেষ মুহূর্ত্তে ট্রেণে উঠিয়াও বরাত জোরে সমস্ত রাত্রি আরামে ঘুমাইয়া আসিলাম।

কাশীতে চকে ঘুরিতে ঘুরিতে সেই ভদ্রলোকটীর সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল, তিনি খুড়োমহাশয়কে বিশেষ করিয়া ধরিয়া বসিলেন যে, তাঁহার পুত্রকে একবার ভাল করিয়া দেখিয়া একটা ঔষধের ব্যবস্থা করিতে হইবে। পরদিন প্রাতে দেখিতে যাইবেন বলিয়া খুড়োমহাশয় তখনকার মত তাঁহার হাত এড়াইলেন।

সকালে খুড়োমহাশয় যে কখন বাহির হইয়া গিয়াছেন, তাহা আমরা জানিতে পারি নাই। দশটার সময় তিনি হাসিতে হাসিতে বাটীতে প্রবেশ করিয়া বলিলেন—বাবা, তীর্থস্থানে ত সকলে খরচ করতেই আসে, কিন্তু এসে উপায় করতে পারে কজনা? তোমাদের না বলে সকালে বেরিয়ে, দশাশ্বমেধ ঘাট

রোডে এক হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারখানায় হাজির হলুম। নানাকথায় ডাক্তার বাবুর সঙ্গে বেশ কোরে আলাপ জমিয়ে পরে হাঁপানির কোন ভাল ওষুধ আছে কি না জিজ্ঞেস করলুম। তিনি খুব ভাল বোলে দুআনা নিয়ে এক শিশি ওষুধ দিলেন। তাঁর কাছ থেকে বুক দেখবার যন্ত্রটা কিছুক্ষণের জন্যে একবার চেয়ে নিয়ে, কচুরী গলির দিকে রওনা হলুম। ডাক্তার বাবু তাঁর যন্ত্রটা ফেরত দেবার জন্যে একজন লোকও সঙ্গে দিলেন. বোধ হয় পাছে অপরিচিত লোকের হাতে যন্ত্রটা খোয়া যায় এই ভয়েই লোক দেওয়া। আমি নিজেই ফেরত দিয়ে যাবো বলেছিলুম, লোক দেওয়ায় আমার সুবিধেই হো'ল। হিন্দুস্থানী ভদ্রলোকের বাড়িতে তার ছেলেকে দেখে ভিজিট আট টাকা আর ওষুধের দরুন দুটাকা মোট দশটি টাকা নিয়ে এই আসচি। খুড়োমহাশয়ের কথা শেষ হইতেই, মণি বলিয়া উঠিল—আপনার বরাত বটে, কিন্তু খুড়োমশাই ও কটি টাকা খরচ কোরে আমাদের খাওয়াতে হবে। আমিও মণির কথায় সায় দিলাম।

কাশীতে দিন পাঁচেক কাটাইবার পর আমরা স্থির করিলাম, দিল্লী যাইব। চুপি চুপিই সমস্ত ব্যবস্থা করিতে লগিলাম, পাছে খুড়োমহাশয় জানিতে পারিয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইবার জন্য ধরিয়া বসেন। খুড়োমহাশয় এই কয়দিনেই কাশীতে

অনেক লোকের সহিত আলাপ করিয়াছেন এবং সর্ব্বত্রই ডাক্তার বাবু বলিয়াই পরিচিত হইয়াছেন। তিনি অধিক সময়ে একাই বেড়াইতে বাহির হইতেন, সেজন্য আমাদের সুবিধা হইয়াছিল। আমরা দুজনে যে পরামর্শ করিয়াছি, তাহার বিন্দু বিসর্গ তিনি জানিতে পারেন নাই।

পরদিন কয়েকটা আবশ্যকীয় জিনিষ পত্র কিনিয়া যখন উপস্থিত হইলাম, দেখি খুড়োমহাশয়, মণির শ্যালক ও একজন পাহারাওয়ালা দরজার সম্মুখে দাড়াইয়া আছে। আমরা আসিতেই খুড়োমহাশয় বলিলেন—"আমাকে এখানে ফেলে রেখে তোমরা দুজনে দিল্লী যাচ্ছ, আচ্ছা বরাতে থাকে ত আমারও যাওয়া হবে। এখন পুলিস সুপারিণ্টেডেণ্ট সাহেবের কাছ থেকে পরোয়ানা এসেচে, একবার ব্যাপারটা কি দেখে আসি।" তখনই খুড়োমহাশয় পাহারাওয়ালার সহিত চলিয়া গেলেন।

আমাদের আর অধিক সময় ছিল না। অল্পক্ষণ পরেই ষ্টেসনের দিকে রওনা হইলাম। ট্রেণে উঠিয়া মণি ও আমি পুলিস সাহেব কি কারণে খুড়োমহাশয়কে ডাকিয়া পাঠাইলেন সে সম্বন্ধে নানারূপ জল্পনা কল্পনা করিতে লাগিলাম। কিন্তু অনেক আলোচনার পর, 'খুড়োমহাশয়কে ডাকাইবার কোনই কারণ থাকিতে পারে না' ইহাই স্থির হইয়া গেল।

[৬]

দিল্লীতে পৌঁছিয়াই প্রথম দিন অনেক দ্রষ্টব্য স্থান দেখিলাম। দ্বিতীয় দিন আর একবার কেল্লা দেখিতে গেলাম। যিনিই দিল্লী আগ্রার প্রাচীন কীর্ত্তিসমূহ দেখিয়াছেন, তিনিই স্বীকার করিবেন যে, ঐ সকল একবার দেখিয়া তৃপ্তি হয় না, ইচ্ছা হয় বারবার দেখি। কেল্লার ভিতরে প্রবেশ করিয়া মণি বিজ্ঞ ঐতিহাসিকের ন্যায় আমাকে মোগল ইতিহাস শুনাইতে লাগিল, আমিও বিনা বাক্য-ব্যয়ে তাহার বক্তৃতা শুনিতে লাগিলাম। দেওয়ানী আম, মতি মস্‌-জিদ ইত্যাদি দেখিয়া শেষে আমরা দেওয়ানী খাসে প্রবেশ করিলাম।

হঠাৎ দুইজনেই থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেলাম। নিজের চক্ষে যাহা দেখিতেছি, তাহাই বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হইতেছিল না। এ কি? দেওয়ানী খাসে যে মর্ম্মর বেদীর উপর সম্রাট সাজাহানের ভুবন বিখ্যাত ময়ূর সিংহাসন বসানো থাকিত, সেই বেদীতে নিশ্চিন্তমনে বসিয়া আছেন, খুড়োমহাশয়! ইনি এখানে কি করিয়া আসিলেন?

"দুনিয়ার মালিক খোদাবন্দ্‌ কসুর মাফ কিজিয়ে" বলিয়া মণি খুড়োমহাশয়ের সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িল। খুড়োমহাশয়—"এই যে তোমরা এসেচ" বলিয়া তাহার হাত ধরিয়া উঠাইলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—খুড়োমশাই ব্যাপার কি? তিনি উত্তর করিলেন—আমার বরাত।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—খুড়ামশাই ব্যাপার কি ?

আমরা বসিলে, তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন—পুলিস অফিসে উপস্থিত হইলে, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, বাবু আপনার নাম কি নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়? আমি উত্তর করিলাম--আজ্ঞে হাঁ। আপনি কলিকাতার জানবাজারে থাকেন, হাঁ। আপনার পেশা কি—সেরূপ কোন কাজ কর্ম্ম করি না। বাবু আপনি আমার কাছে মিথ্যা বলিতেছেন, আপনি হোমিও-প্যাথিক ডাক্তার—বলিয়া সাহেব আমার দিকে চাহিয়া একটু হাসিলেন। আপনি এখানেও কচুরী গলির বাবু বিশ্বেশ্বর প্রসাদের পুত্রের চিকিৎসা করিয়াছেন। আপনার চেহারাতেই আপনাকে বিশেষ চালাক লোক বলিয়া বোধ হইতেছে, আপনি কয়েকদিন পূর্ব্বে আপনার পূর্ব্বেকার বড় দাড়ী ছাঁটিয়া ফেলিয়াছেন। সাহেব আপনি ভুল করিতেছেন, আমি কোন কালেই বড় দাড়ি রাখি নাই। আচ্ছা বাবু আমার ভুল হইতে পারে, কিন্তু আপনাকে এখানে কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করিতে হইবে—বলিয়া সাহেব নিজের কার্য্যে মন দিলেন। ইনেস্পেক্টরের ইঙ্গিতে আমি সেখান হইতে উঠিয়া আসিয়া পার্শ্বের একটি ঘরে বসিলাম।

দীর্ঘ চার ঘণ্টা কাল নানা ভাবনায় কাটিবার পর, সাহেবের কাছে পুনরায় ডাক পড়িল। সাহেব বলিলেন, বাবু আপনাকে রাত্রের ট্রেণে আমরা দিল্লীতে পাঠাইব। দিল্লীতে একটী মকদ্দমার ডাক্তার নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় নামে একজন বাঙ্গালী

পলাতক আসামীর জন্য এই পুলিস অফিসে সংবাদ আসিয়াছিল। গুপ্তচরের সাহায্যে আমি আজ আপনার সংবাদ পাইয়াই আপনাকে এখানে ডাকাইয়া আনিয়াছি। অন্য সব ঠিক মিলিলেও, আমরা আসামীর আকৃতির যে বিবরণ পাইয়াছি, তাহার সহিত আপনার আকৃতির কিছু অমিল দেখিতেছি। সেজন্য দিল্লীর পুলিস অফিসে টেলিগ্রাম করিয়াছিলাম, সেখান হইতে এখনি উত্তর আসিয়াছে। আপনাকে সেখানে পাঠাইতে বলিয়াছে, সেইখানে সোনাক্ত করা হইবে। আপনার যাহাতে কোনরূপ অসুবিধা না হয়, আমি তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিব।

একজন হিন্দুস্থানী ইনেস্পেক্টরের সহিত সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ীতে করিয়া খুব আরামে এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। রাত্রে পুলিস অফিসেই ছিলাম, আহারাদিও প্রচুর হইয়াছিল। আজ সকালে পুলিসের বড় সাহেবের নিকট হাজির হইতে হইয়াছিল। তিনি আমাকে দেখিয়া ও কয়েকটা প্রশ্ন করিয়া শেষে বলিলেন যে, বাবু ভুল করিয়া আপনাকে এখানে আনা হইয়াছে, সেজন্য আমি বিশেষ দুঃখিত। আপনি এখন মুক্ত, কোথায় যাইতে চাহেন? আমি বলিলাম, কলিকাতার বাটীতে যাইব। সাহেব তখনই একজন অফিসারকে ডাকিয়া, কলিকাতা পর্য্যন্ত সেকেণ্ড ক্লাসের ভাড়া সাড়ে বিয়াল্লিশ টাকা ও পথ খরচের জন্য দশ টাকা দিতে হুকুম দিলেন। আমি টাকা কড়ি লইয়া, প্রথমেই কেল্লা

দেখিতে আসিয়াছি। ভাবিতেছিলাম, যদি তোমাদের দেখা পাই বড় ভাল হয়। তাহা হইলে দিন কতক থাকিয়া সকল দ্রষ্টব্য স্থান দেখিয়া লই। ভগবান আমার সে কামনা পূর্ণ করিয়াছেন, তোমরা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ। খুড়োমহাশয় বক্তব্য শেষ করিলে, মণি বলিয়া উঠিল—'বরাত বটে!'

নকলে আসল

[১]

সে আজ অনেক দিনের কথা—তখন আমরা আমেদপুরে থাকিতাম। সে সময় খুব আমোদেই দিন কাটিত; এখন কৈশোরের সে সব দিনের কথা স্বপ্ন বলিয়া মনে হয়। সেখানে আমাদের একটা জিমনাষ্টিকের দল ছিল, গ্রামের সকল ছেলেরই সেই দলভুক্ত না হইয়া থাকিবার আর উপায় ছিল না। গ্রামে দুই চারিজন বৃদ্ধ ব্যতীত অপর সকল বয়স্ক ভদ্রলোকই অর্থোপার্জ্জন উদ্দেশ্যে সহরে থাকিতেন। আমরাই গ্রামের সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলাম। জিমনাষ্টিক দলের বিরুদ্ধে ভয়ে কেহ কথাটি পর্য্যন্ত কহিতে পারিত না। আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারে জগতে এমন লোক কেহই নাই, ইহাই আমাদের ধারণা ছিল।

আমাদের মধ্যে নারাণ সকলের অপেক্ষা ভাল জিমনাষ্টিক করিতে পারিত। জাতিতে সে তাঁতী হইলেও দলের উপর তাহারই অধিক প্রভুত্ব ছিল। আমরা ব্রাহ্মণ কায়স্থের ছেলেরা অনেক সময় নারাণের কথা মতই চলিতাম। নারাণের সংসারে

কেহ ছিল না। পিতা মাতা উভয়েই তাহাকে পাঁচ বৎসরের শিশু রাখিয়া পৃথিবী ত্যাগ করিয়াছিলেন। দূর সম্পর্কের এক বৃদ্ধা পিসির নিকটে সে থাকিত। পিসি অতি কষ্টে নিজের ও নারাণের জন্য রন্ধন করিতেন। নারাণ খুব ভাল তাঁতের কাজ জানিত, মন দিয়া কাজ করিলে সে দিন ১৷০ হইতে ১৷৷০ রোজগার করিতে পারিত। কিন্তু সে কখনও কাজের দিকে, রোজগারের দিকে বেশী মনযোগ দিত না, জিমনাষ্টিক লইয়াই সময় কাটাইয়া দিত।

হঠাৎ একদিন বিসূচিকায় বৃদ্ধার মৃত্যু হইল। নারাণের আর কোন অবলম্বন রহিল না। কিন্তু ইহাতে তাহার কোন অসুবিধা বা কষ্টের ভাব দেখা গেল না! নিজের রন্ধনাদি সারিয়া সে আবার ঠিক সময়েই আমাদের দলে আসিয়া যোগ দিতে লাগিল। তাহার যে কোনরূপ অসুবিধা হইতেছে, তাহা কাহাকেও বুঝিতে দিল না। তাঁতের কাজ, রন্ধনাদি ও জিমনাষ্টিক্ এক সঙ্গেই চলিতে লাগিল।

নারাণের বয়স একুশ কি বাইশ বৎসর হইয়াছিল। এই বয়সে অনেকেরই বিবাহ হইয়া যায়, কিন্তু আমরা অনেক চেষ্টা করিয়াও নারাণের জন্য একটি পাত্রী যোগাড় করিতে পারিলাম না। নারাণ দেখিতে সুশ্রী ও উপার্জ্জনক্ষম হইলেও, অভিভাবক-হীন বলিয়া তাহাকে কেহ কন্যা দিতে রাজি হইল না। আমরা

কিন্তু আশা ছাড়িলাম না, কিরূপে নারাণের বিবাহ দেওয়া যায় সে জন্য দলের সকলেই সচেষ্ট রহিলাম।

[১]

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে নিকটবর্ত্তী চার পাঁচখানি গ্রামের তাঁতীরা সভা করিয়া স্থির করিয়াছিল যে, বিবাহে পণ গ্রহণ বন্ধ করিতে হইবে, কেবল মান্য হিসাবে বরপক্ষ ২৫৲ টাকা কন্যাপক্ষকে দিবে। বাহিরে এইরূপ নিয়ম থাকিলেও, ভিতরে ভিতরে কন্যাপক্ষ বরপক্ষের নিকট ১০০ হইতে ২০০।২৫০ টাকা পর্য্যন্ত আদায় করিত। আমরাও অধিক টাকা দিয়া নারাণের জন্য কন্যাপক্ষকে রাজি করিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কিছুতেই সুবিধা হইয়া উঠিল না।

আমেদপুরের পশ্চিমে কালী নদী, সে নদীতে বর্ষা ব্যতীত অন্য সময়ে এক বিন্দুও জল থাকিত না। কেবল অর্দ্ধ মাইল বিস্তৃত বালু ধূ ধূ করিত। অপর পারে রূপগঞ্জ গ্রামে অনেক তাঁতীর বাস ছিল। একদিন দ্বিপ্রহরে আহারের পর আখড়ার বসিয়া আমরা গল্পগুজব করিতেছিলাম, সেই সময় দলের দুইজন রূপগঞ্জ ঘুরিয়া আসিয়া বলিল, "আজ ওপারে অনেক তাঁতীবাড়ী বিয়ে, কেবল আমাদের নারাণেরই বিয়ে হো'ল না।" "হবে আর কি কোরে, তোরা তো চেষ্টা কোরবি না" বলিয়া নারাণ হাসিয়া উঠিল।

অল্পক্ষণ পরে নারাণের মাথায় এক মজার খেয়ালের উদয় হইল। সে খেয়ালের কথা আমাদের বলিতেই আমরা তদনুযায়ী কার্য্য করিতে রাজি হইয়া গেলাম। তখনকার মত আমাদের সভা ভঙ্গ হইল, আমরাও কার্য্য সিদ্ধির ব্যবস্থা করিতে বিভিন্ন দিকে বাহির হইয়া পড়িলাম।

সন্ধ্যাবেলা দলের সকলে নদীর তীরে আসিয়া জমা হইলাম। পূর্ব্বেকার ব্যবস্থা মত ঢুলি পাল্কি উপস্থিত রহিয়াছে দেখিলাম। নারাণ চেলী পরিয়া, চন্দন মাখিয়া পাল্কিতে উঠিয়া বসিল। বরযাত্রী হইলাম জিমনাষ্টিক দলের আমরা তেইশ জন। পাল্কিতে উঠিয়া নারাণ আমার হাতে কতকগুলি নোট দিল, বলিল, "রাখ যদি কাজে লাগে।" গণিয়া দেখিলাম চল্লিশখানি, মোট চারিশত টাকা। নকল বর, বরযাত্রী, বাদ্যকর সকলে রূপগঞ্জের দিকে রওনা হইলাম।

নদী পার হইয়া রূপগঞ্জে পৌছিয়াই ঢুলিরা বাজনা আরম্ভ করিয়া দিল। চারিদিক হইতে সাড়া পড়িয়া গেল, যে বর আসিতেছে। কিয়ৎদূর অগ্রসর হইতে না হইতে একটি বিবাহ বাটী হইতে শঙ্খধ্বনি হইতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে "বর আসচে" "বর আসচে" চীৎকার। আমরা সেই স্থানেই পাল্কি নামাইতে বলিলাম। ঢুলি আরও জোরেই বাজাইতে লাগিল। কন্যা কর্ত্তারা শশব্যস্ত, কেহ বলিল—দত্ত মশাই কোথা? কেহ বলিল—পাল

মশাই, দে মশাই কোথা? আমরা সকলকেই উত্তর দিলাম, আসচেন।

নানা গোলমালে বর নামাইতে দেরী হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে বাদ্য ভাণ্ড সমেত আর এক বর সেই বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। উভয় দলে ভীষণ ঝগড়া বাধিয়া গেল। আমাদের জানাই ছিল যে, আজ বিশেষ একটা কিছু ঘটিবে, পূর্ব্ব হইতেই প্রত্যেকে এক এক গাছি লাঠি সংগ্রহ করিয়া আসিয়াছিলাম। শেষোক্ত দল বলিল, তোমরা বর নিয়ে যাও, আমাদের পাত্রেরই এই বাড়িতে বিয়ের স্থির হয়েচে। আমরা লাঠি উঠাইয়া সমস্বরে বলিয়া উঠিলাম, তা কখনই হতে পারে না, আমরা এইখানেই বিয়ে দেবো, তোমরা বর নিয়ে সরে পড়। কন্যাপক্ষরা আমাদের দলের রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া গেল। কিন্তু আসল বরপক্ষের লোকেরা ক্রমশঃই অধিক উত্তেজিত হইতে লাগিল।

একবার নারাণের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, সে পাল্কির মধ্যে বসিয়া কেবল হাসিতেছে, আর যাহাতে ঝগড়াটা জাঁকিয়া উঠে তাহার জন্য আমাদিগকে ইসারা করিতেছে। আসল বরপক্ষ কিছুতেই সুবিধা হইতেছে না দেখিয়া, কন্যাপক্ষকে বলিল, আমাদের ১০০৲ টাকা দেবার কথা ছিল, আমরা আর ২৫৲ টাকা বেশী দেবো, আমাদের পাত্রের সঙ্গেই বিয়ে দিতে হবে। আমাদের

যদি ফিরে যেতে হয়, তা হোলে লোক সমাজে মুখ দেখান ভার হবে। আমরা বলিলাম, ১৫০৲ টাকা দেবো, আমাদের পাত্রের সঙ্গেই বিয়ে দিতে হবে। এইরূপে কথা কাটাকাটি ও টাকার পরিমাণ ক্রমশঃই বাড়িতে লাগিল। আসল বরপক্ষ ১০।১৫ টাকা করিয়া বাড়িতে বাড়িতে ২৫০৲ টাকায় আসিয়া থামিয়া গেল। আমরা বলিলাম, ৩০০৲ টাকা দেবো, বিয়ে আরম্ভ হোক। ৩০০৲ শত টাকা শুনিয়া, একজন বলিল—আপনারা যখন এত টাকা খরচ করতে রাজি, তখন এখানে কাছেই আমি ভাল কনে ঠিক করে দিচ্চি। আমরা তিন চার জনে তাহার সঙ্গে কনে দেখিতে গেলাম।

কনে দেখিয়া আমাদের বিশেষ পছন্দ হইল। তখনই বর উঠাইয়া বাদ্যসমেত সেই বাটীর দিকে রওনা হইলাম। তখন আমাদের আনন্দ দেখে কে, যুদ্ধ জয় করিলেও বোধ হয় সেনাপতির এত আনন্দ হয় না। আমাদের সঙ্গে টোপর হাতে করিয়া নাপিত আসিয়াছিল কিন্তু পুরোহিত আসেন নাই। কারণ নকল বরের সঙ্গে যাইবার জন্য পুরোহিতকে রাজি করা সহজ নয়। এক্ষণে পাল্কি পাঠাইয়া তাড়াতাড়ি পুরোহিত মহাশয়কে আনাইয়া লওয়া হইলে, যথাসময়ে শুভকর্ম্ম সুসম্পন্ন হইয়া গেল। হইল না কেবল বরযাত্রীদের ভোজন। রাত্রি দ্বিপ্রহরে আমরা সকলে শূন্য উদরে গ্রামে ফিরিয়া আসিলাম।

পরদিন যথাসময়ে সকলে মিলিয়া, ঢুলির সংখ্যা দ্বিগুণ করিয়া যখন বর কনে লইয়া গ্রামে ফিরিলাম, তখন সমস্ত গ্রামময় আনন্দের সাড়া পড়িয়া গেল। কল্যকার নকল বর যে আজ সত্য সত্যই আসল বর হইয়া কনে সঙ্গে গ্রামে ফিরিল ইহাতে আমাদের আনন্দই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। প্রতিবেশী মহিলারা বর কনে বরণ করিয়া মৃত বৃদ্ধার ঘরে তুলিয়া লইলেন। আমরা প্রাতেই ঘরটা যথাসম্ভব সাজাইয়া রাখিয়াছিলাম। এতদিনে যে নারাণ সংসারী হইল, ইহাতে সকলেই আনন্দ বোধ করিতে লাগিলেন।

[৩]

বিবাহের চার দিন পরে আখড়ায় বিশেষ ধূম পড়িয়া গেল। জিমনাষ্টিক দেখার জন্য আমরা গ্রামের স্ত্রীপুরুষ সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলাম। সে দিনের সকল খেলাই বিশেষ উৎরাইয়া গেল। উচ্চে দোলনার উপর নারাণের নানারূপ অদ্ভুত খেলা দেখিয়া সকলেই একবাক্যে বাহবা দিতে লাগিলেন। আমরা আখড়ায় আর সকলেও যথাযোগ্য বাহবা পাইলাম! বালক বালিকা পরিবৃত হইয়া দর্শকগণের মধ্যস্থলে বিশিষ্ট আসনে বসিয়া নারাণের বৌ সকল খেলাই দেখিল। কিন্তু খেলা দেখিয়া যে, সে আর সকলের মত আনন্দ পাইয়াছে, তাহার মুখের ভাবে সেরূপ বোধ হইল না।

পরদিন প্রভাতেই নারাণকে আখড়ায় আনিবার জন্য ডাকিতে গেলাম। নারাণ বলিল, আর জিমনাষ্টিক কোরবো না।

কেন রে? হটাৎ আবার কি খেয়াল হো'ল।

খেয়াল নয়, একবারে ঠিক করেই ফেলিছি।

আচ্ছা দেখা যাবে, এখন ত আখড়ায় চল।

আর আখড়ায় পর্য্যন্ত যাবো না।

সে কি রে? সত্যিই না কি। তুই না গেলে যে আখড়া একেবারে উঠে যাবে।

নারাণ গম্ভীর ভাবে বলিল--কি কোরবো, উপায় নেই।

কেন তোর বৌ বুঝি বারণ করেছে, বলিয়া আমি হাসিয়া উঠিলাম।

হাঁ তাই বটে। তুই যদি সব কথা স্থির হয়ে শুনিস্ তবে বলি। 'আচ্ছা আয় ঐ গাছ তলায় বসে শুনিগে'—বলিয়া নারাণকে টানিয়া লইয়া গিয়া, তাহার ঘরের পার্শ্বে আম গাছের নীচে দুইজনে বসিলাম।

নারাণের মুখে সকল কথা শুনিয়া, জানিতে পারিলাম—জিমনাষ্টিক দেখিয়া আসিয়া রাত্রে নারাণের বৌ তাহাকে বলিয়াছিল যে, 'ওসব করা ভাল নয়, হটাৎ পড়িয়া গিয়া বিপদ ঘটিতে পারে। দোলনার খেলা দেখিয়া তাহার বিশেষ ভয় করিতেছিল, অন্যান্য খেলাও মোটেই ভাল লাগে নাই।
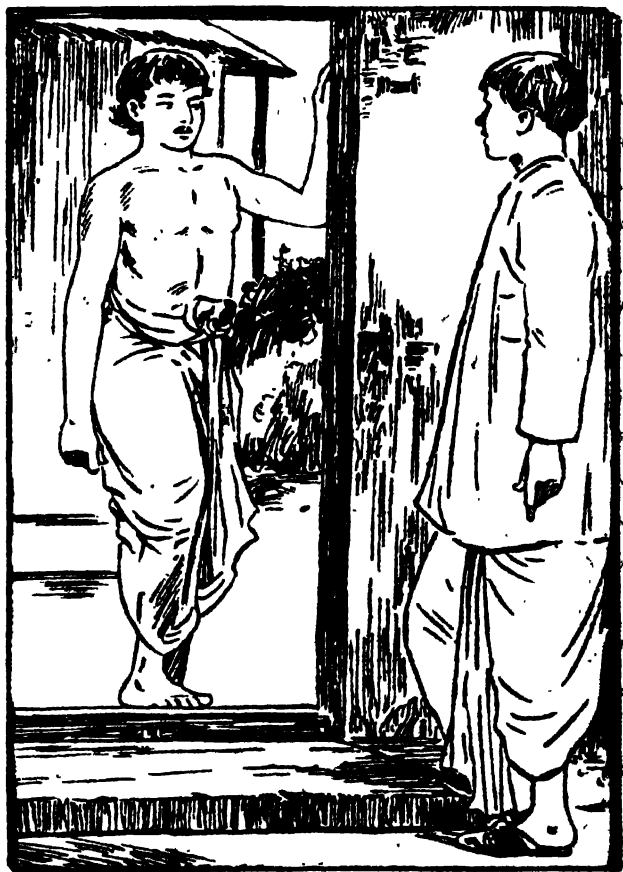
নারাণ গম্ভীর ভাবে বলিল—কি কোরবো, উপায় নেই।

নারাণ তাহাকে ভাল করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিল যে, যাহাদের ভাল অভ্যাস আছে তাহাদের কোন বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু বৌ সে কথা বিশ্বাস না করিয়া, নারাণ যাহাতে জিমনাষ্টিক পরিত্যাগ করে, বারবার সেই অনুরোধই করিয়াছিল। "জিমনাষ্টিক করিবার সময় নারাণ যেন দোলনার উপর হইতে পড়িয়া গেল" স্বপ্নে এই দৃশ্য দেখিয়া গভীর রাত্রে নারাণের বৌ চীৎকার করিয়া জাগিয়া উঠে এবং তখনই তাহাকে প্রতিজ্ঞা করাইয়া লয় যে, জিমনাষ্টিক করা ত দূরের কথা সে কখনও আর আখড়ায় পর্য্যন্ত যাইতে পারিবে না। নারাণ তর্কের দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিল যে, স্বপ্ন কখনও সত্য নহে। কিন্তু বৌ উত্তরে জানাইয়াছিল—নকল বর যখন আসল বর হইয়া যাইতে পারে, তখন সপ্নের ঘটনা সত্যে পরিণত হওয়া কিছুই অসম্ভব নয়। নারাণকে অগত্যা চিরকালের মতই আখড়া পরিত্যাগের প্রতিজ্ঞা করিতে হইয়াছে।

নারাণ আর এক দিনের জন্যও আখড়ায় আসিবে না শুনিয়া দলের সকলেই দমিয়া গেল। অনেক চেষ্টা করিয়াও কেহই নারাণকে আর আখড়ায় আনিতে পারিল না। একমাসের মধ্যেই আমাদের আখড়া উঠিয়া গেল। আমিও তিন মাস পরে পড়িবার জন্য সহরে চলিয়া আসিলাম।

চার বৎসর পরে একদিনের জন্য আমেদপুরে গিয়াছিলাম। গিয়া দেখিলাম, আখড়ার জমিতে কড়াইক্ষেত হইয়াছে। নারাণের বাটীর দিকে গেলাম, তাহার সহিত দেখা হইল না। উঠানে একটি শিশু খেলা করিতেছিল, ধরিতে চেষ্টা করিলাম; ছুটিয়া মায়ের নিকট পলাইয়া গেল। ছেলেটীর অবিকল নারাণের মুখের মত মুখ।

সমাপ্ত